মলয়া
বা
সদ্ভাব সঙ্গীত

[প্রথম খণ্ড]

পূজাৎ কোটী ফলং স্তোত্রং, স্তোত্রাৎ কোটী ফলোজপঃ।
জপাৎ কোটী ফলং গানং, গানাৎ পর তরং নহি।

সত্যমেব জয়তে।

দিবানিশি চয়,
তাঁর ভাবে থাকতে হয়
যদি দয়া হয়, কোন কালে।
নৈলে পাওয়া ভার,
লড়ালড়ি সার,
করঙ্গধারী এক বাউল বলে।

—মনোমোহন

আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
একবিংশতিতম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা শিবপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতিধর **ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন গুণাকর** কর্তৃক তানলয়ে গ্রথিত।

মলয়া
সৌদামিনী দত্ত-এর তিরোভাব দিবস স্মরণ সংস্করণ

প্রকাশকাল
একবিংশতিতম সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
জুন ২০১২

প্রকাশক
বিল্বভূষণ দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রচ্ছদ
ফনি ভূষণ দেবনাথ

শব্দ অলংকরণ
জয় কম্পিউটার
২৬২/ক, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০২-৭১৯১৯১২, ০১১৯৯-০৯৪১৩১
E-mail : joy95fani@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা
তিন হাজার
মূল্য :
একশত দশ টাকা মাত্র

MALAYA (Some mystic songs) by Monomohan Datta Published by Bilwa Bhushan Datta, Ananda Ashram, Satmora, Brahmanbaria, Price : One Hundred Ten Taka only.

ISBN-978-984-33-5487-7

জয় কম্পিউটার ও প্রকাশনী বই নম্বর ০০৭

উৎসর্গ পত্র

হৃদি দরপণে ; আলো ছায়া যাঁর,
চকিতে ভাসিয়া উঠে।
যাঁহার স্মরণে আঁধার পরাণে,
হাসিয়া আলোক ফুটে।
যাঁর করুণার, কণিকা পাইয়া,
ফুটিয়াছে প্রাণ কলি–
উদাসিয়া চিতে, যাঁর প্রেম মধু
পিয়িতে ভকতি অলি–
ছুটাছুটি করে, তাঁরি জবা রাঙ্গা–
– শ্রীপদ যুগল তলে।
কুড়ায়ে কুড়ায়ে, পাঁপ্‌ড়ি ছিঁড়া এই
ক'টা ফুল দিনু ঢেলে।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কাননে ফুল আপনি ফুটে,
বিহগে গীত আপনি গায়।
ফুলটা নিজে ফুটেই সুখী,
আপনা রঙ্গ আপনি চায়।

কাননে কত ফুল ফুটে, কত বা ঝড়িয়া পড়ে, শুকাইয়া যায়, আর কত অফুটন্ত ফুলকলি মলয় হাওয়াতে হেলিয়া দুলিয়া, প্রভাতে সন্ধ্যায় পাতার আড়ালে, অবগুণ্ঠনবতী নব বধুটীর মত মুচ্‌কী হাসে ; কি জানি কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে কার জানি প্রেমে, আপ্‌নি আপ্‌নি প্রাণভরা হাসি দিতে চায় আর অমনি পাপ্‌ড়ি ছড়াইয়া ফুটিয়া উঠে। ফুটিলেই গন্ধ আর লুকাইয়া থাকিতে পারে না, আপনা হইতে হাওয়া আসিয়া সৌরভ লুটিয়া চৌদিকে লোকালয়ে ছড়াইয়া দিয়া, পথে ভাবুকের কানে নিরালায় মরমের কথা চুপি চুপি ক'য়ে ক'য়ে, অনন্তের কাছে খবর দিতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া যায়।

জীবজগতে প্রত্যেক ক্ষুদ্র মহৎ প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনের বিকাশও ফুলটীর মত এই রকম করিয়াই হইয়া থাকে। আজ আমরা যাহার কথা বলিব তিনি আমাদের এতদ্দেশীয় একটী ফুল বিশেষ। ত্রিপুরাজেলার অন্তঃপাতী সাতমোড়া গ্রামে ১২৮৪ সনের ১০ই মাঘ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় পদ্মনাথ দত্ত মহাশয়ও নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী, সরল, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তৎপুর্ব্ব সময়ের অবস্থা নিরতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন থাকিলেও দৈবদুর্ব্বিপাকে সকল হারাইয়া, তিনি কেবল কবিরাজি ব্যবসা দ্বারাই ভ্রাতা, পুত্র পরিবেষ্টিত একান্নভুক্ত বহু পরিবারকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিয়া এলাকা বাসী আপামর সাধারণের নিকট যতপরোনাস্তি সম্মান ও যশলাভ পূর্বক ১৩০৯ সনে মৃত্যুর ৭ দিন পূর্ব্বে মরণের নির্দ্দিষ্ট কথা বলিয়া, মহালয়া প্রতিপদ দিন সকলকে নিকটে ডাকিয়া, এক রকম সুস্থ দেহে যোগীদের মত যোগাসনে বসিয়া, ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাঁচটি পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া যান। অব্যবহিত কাল পরেই দুইটি কন্যাও যেন সেই মহাপুরুষের সেবার জন্যই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গ্রামের স্কুলে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি মাত্র পাশ করিয়া অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ আর প্রাপ্ত হন নাই। সেই

হইতেই বিবেকীর মত হইয়া ১৩০৩ সনে স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ স্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই স্বামী মহাশয় উক্ত গ্রামে আসিতেন ও তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং পরে ক্রমে তাঁহারই নিকট তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে উক্ত রচয়িতাকে যে সকল কথা মনে জাগে তাহাই লিখিয়া রাখিতে আদেশ করেন। মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চারে তাহার কিছুকাল পরেই অতি আশ্চর্য্যভাবে কবিত্বশক্তি বিকাশ হয় এবং সেই হইতে অল্প দিনের মধ্যে সাতিশয় সুন্দর ও গভীর ভাবব্যঞ্জক প্রায় ১০০০ কবিতাপূর্ণ “তপোবন”, “উপবন”, “নির্ম্মাল্য” নামে তিনখানা কাব্যগ্রন্থ “প্রেম ও প্রীতি”, “পথিক”, “সত্যশতক”, “ময়না”, “যোগ-প্রণালী”, “উপাসনাতত্ত্ব” এবং “খনি”,- আত্মতত্ত্ব সাধনের সরল রহস্যপূর্ণ এই কয়খানা এবং “সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বসার” নামে অতি জটিল তত্ত্বসম্বন্ধীয় ২০০ টী বিষয়ের সহজ বোধগম্য সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহ প্রকাণ্ড পুস্তক লিখেন। কিন্তু তৎকালেও রচয়িতার বয়স ২০ বৎসরের অধিক হয় নাই।

স্বামী মহাশয় অল্প বয়সে এই সকল কবিতা ও রচনার ভাবপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তোষের সহিত প্রশংসা করিতেন ও উৎসাহ দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনিও ১৩০৭ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সস্ত্রীক একই সময়ে মানবলীলা সংবরণ করেন। অতঃপর ১৩০৯ সনের মহালয়া প্রতিপদ দিন রচয়িতার পিতৃবিয়োগ হয়, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞানদাতা এবং জন্মদাতা পিতা উভয়কে হারাইয়া নিতান্ত নিরুপায়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায়, সাংসারিক অস্বচ্ছলতার দরুণ বিষয় কর্ম্মের অনুসন্ধানে নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, স্বামী মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছেন “তোমার বিষয় হইবে না” এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার জন্যই যেন সুবিধা হয় হয় করিয়াও কোথাও কিছু হইল না বরং কোনও স্থানে অজানিতভাবে অকস্মাৎ বিপন্ন হইয়া আবার অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় সুবিধার অভাবে ১৩১১ সনের কার্ত্তিক মাসে বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তাহার সামান্য কিছুকাল পর, একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময়ে তিনি বাড়ীর দক্ষিণে পুষ্পোদ্যানে একটী বিল্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভিক্ষুকের বেশে একটী ফকির আসিয়া উক্ত বৃক্ষতলে আসন গ্রহণ করিলেন, উভয়ের কথোপকথনে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইলে পর হঠাৎ কতকগুলি আলৌকিক শক্তি অতি আশ্চর্য্য ভাবে বিকাশ হইয়া পড়ে, এই অবস্থায় সেই ফকিরসহ তিনি সেখানে প্রায় তিনমাসকাল

অবস্থান করেন। এই সময়ে অনেকানেক লোক দুরারোগ্য পীড়ায় আরোগ্য লাভ আকাঙক্ষায় সেইখানে আসে ও আরোগ্য হয়। শিবপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন তাহাদের মধ্যে একজন, সেও পিত্তশূল ব্যাধিতে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ভগবদিচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিলে কিছুকাল পর উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কোনও আত্মীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য উক্ত ফকির ও আপ্তাবদ্দিন এবং আরও কয়েকজন লোকসহ গ্রামান্তরে যান, সেখানে কোনও দুষ্ট ব্যক্তি স্বভাবতঃ হিংসাপরবশ হইয়া নানা প্রকার আভিচারিক ক্রিয়া করণপূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাদিগকে পান করিতে দেয়, তাহার পর হইতে তিনি বিষপানজনিত দুর্ব্বিসহ জ্বালা যন্ত্রণাতে নিতান্ত অস্থির ও উন্মনস্ক হইয়া পড়েন। আপ্তাবদ্দিনসহ আরও অন্যান্য সঙ্গীয় লোক পাগল হইয়া যায়। দয়াময়ের দয়াতে প্রায় দেড় বৎসর পরে কতক সুস্থ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন। সঙ্গীয় লোকসকলও অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয় এবং তখন হইতে গুরুদেবের পূর্ব্ব আদেশে গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াই উপরোক্ত বটবৃক্ষতলে একখানা কুড়েঘরে বসিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এ যাবত তাঁহার রচিত কোনও বিষয় অন্য কাহাকেও জানিতে দেন নাই, তবে আপ্তাবদ্দিন সঙ্গীতগুলির মধ্যে কয়েকটী অতি সুন্দর দেখিয়া সুর, তান, লয়যোগে গান করিবার জন্য একখানা বহিতে লিখিয়া লইয়া যায়, এবং একটী করিয়া তাহার নিজ প্রাণের আবেগে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে তাহার মুখে শুনিয়া আপামর সাধারণ, সকল ব্যক্তিই এই সকল সঙ্গীতের প্রতি নিতান্ত প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, সেইজন্য এই কাল পর্য্যন্ত রচিত ৮৫০ সঙ্গীতের মধ্যে মাত্র ২৮৭টী সঙ্গীত সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে আমি ছাপাইয়া দিলাম। সকলে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিলে আমার এই যত্ন ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব ; এবং সাধারণের অনুগ্রহ পাইলে অন্যান্য গ্রন্থগুলিও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। ইতি

শ্রী লবচন্দ্র পাল বি, এ,
সুপারিন্টেনডেন্ট, আনন্দ-ভাণ্ডার।

প্রথম সংস্করণের
ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী অতৃপ্ত কোলাহলের তৃপ্তি কোথায় ?-না, আত্মজ্ঞানে। আত্মজ্ঞান বা আত্মপরিচয়ই মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিশ্লেষণ হইতেই এমন এক বস্তু সম্মুখীন হয়, যাহা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমানন্দস্বরূপ।

আত্মবিশ্লেষণের এই পরমানন্দ চরম অবস্থা লাভ করিবার জন্য জগতে অনেক পথ নির্ণীত হইয়াছে। তাহার এক এক পথে যে সকল লোক চলিয়াছে, তাঁহারা এক এক সম্প্রদায় বলিয়া সমাজে পরিচিত। এই সাম্প্রদায়িকতা আদর্শ ধর্মনেতার মূল চরিত্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া, অনেক কুসংস্কার ও গোঁড়ামীতে প্রকৃত মৌলিকতত্ত্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কেবল বাক্‌বিতন্ডার সৃষ্টি করিতেছে। ইহার মধ্যে যাহা কিছু সত্য অন্তর্নিহিতভাবে আছে, তাহা বাহ্যভাবের সংক্রামক নিষ্পেষণে প্রায়ই সত্যের ধূয়ামাত্র রাখিয়া কেবল কতকগুলি কূট প্রশ্নজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদর্শ ধর্মনেতা মহাত্মাগণ কেহই কৈতবযুক্ত হৃদয় লইয়া ধর্ম প্রচার করেন নাই। সকলেই আপন আপন হৃদয় নিহিত সত্যকে সরলভাবে লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিক তত্ত্ববিদ্যা পারদর্শী মহাত্মাগণের জীবনে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে তাহারা সকলেই বিশেষ বিশেষ সত্যে অনুপ্রাণিত। সত্য সকলের জন্যই সত্য, এবং সত্য এক। ইহাতে কোন ভেদ নাই। মহাত্মাদিগের চরিত্র ও উপদেশ তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। তবে আমরা সর্বসম্মত সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, একে আরে বাদবিসংবাদে নিজ নিজ গন্তব্য পথ জটিল ও বিঘ্নসঙ্কুল করিতেছি কেন ? বস্তুতঃ প্রথমেই আমাদের ইহা বিশেষ তলাইয়া বুঝা নিতান্ত আবশ্যক।

সাকার, নিরাকার, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, এই সকল তত্ত্বসম্বন্ধনীয় বাদানুবাদে লিপ্ত না হইয়া প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত কেবল আত্মতত্ত্বে দৃষ্টি করিলেই ভাবসমষ্টি মানবের মন সহজেই মীমাংসাতে উপস্থিত করিয়া লয়; বিশেষতঃ যে কোন বিষয়ে মনের একটু সংশয় যোগ থাকিতে প্রকৃত ঈশ্বরীয় যোগ লাভের উপযোগিতাপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় সেই সর্ব্বজনীন সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক,– যাহা শুদ্ধ নির্মল, অকৈতবপূর্ণ এবং যাহাতে জগতের যোগ রহিয়াছে–সেই সত্যে আসিলে দেখিতে পাই বাস্তবিক

সর্ব্বধর্মের মৌলিকত্ব এবং আত্মতত্ত্ব পরস্পর অবিরোধী ভাবাপন্ন, এক। এই সর্ব্বধর্ম সমন্বয় যোগ প্রত্যেক সাধক জীবনে লাভ করা স্পৃহণীয় ও একান্ত কর্তব্য। সাম্প্রদায়িকতার যে সকল হাবভাবও ভ্রূকুটী আমাদিগকে সত্য হইতে বিচলিত করে, প্রকৃত সত্যলোলুপ হৃদয় সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া যেন কি এক অলৌকিক আকর্ষণে, অমানুষী চরিত্রলাভে প্রকৃত পথের পথিক হয়। মানুষ চারিদিক হইতে তাহাদের স্বাভাবিক অভিসন্ধিতে সেই সত্যাকাঙ্ক্ষী হৃদয়ের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করে ও যন্ত্রণা দেয়। ধীমান্ সাধক, সেদিকে লক্ষ্যও করে না। আবহমান কাল হইতেই জগতে এবম্বিধ ব্যাপার চলিয়াছে। বরং এই লীলা রহস্য হইতেই সত্যানুসন্ধিৎসা তৎপর সাধক বল সঞ্চয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় ; এবং ইহাই পরীক্ষা। প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতিভা এই বিরুদ্ধ ভাবতরঙ্গের মধ্য হইতে প্রবলবেগে পদ্মের মৃণালের ন্যায় উপরে ঠেলিয়া উঠে। যাহা উপরে উঠিতে পারে তাহাই প্রতিভা নামধেয়। সেখানেই বিষধর সর্পের মস্তকস্থ মণির ন্যায় কলঙ্ক হলাহলের শিরোদেশে উজ্জ্বল মনুষ্যত্ব মণি ঝক্ ঝক্ জ্বলিয়া থাকে। এমতাবস্থায় সাধক ক্রমোন্নতিতে সঙ্কল্পের শীর্ষস্থলে পৌছিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হৃদয়ে পূর্ণমনোরথ হইয়া, জগৎসমক্ষে আত্মবলিদান দিয়া অনন্ত হৃদয়ের সিংহাসন কাড়িয়া লয়, এবং প্রকৃত সত্যের মহিমায় জয়ধ্বনি করে।

প্রকৃত্ত তত্ত্ব উপলব্ধি আর সর্ব্বধর্ম সমন্বয় ঠিক যে একই কথা চিন্তাশীল ভাবুক হৃদয় সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আমাদের অনন্ত উন্নতির অন্তরায়। আমরা ধর্মভীরু ; এস ! সকলে সমপ্রাণতায় প্রকৃত তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া সত্যের জয় ঘোষণা করি।

ওঁ নমো শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

দশম সংস্করণের

নিবেদন

'মলয়া'র পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, ছোটনাগপুর, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর নিকট হইতে যে ভাবে মলয়ার অর্ডার পাই, তাহাতেই বুঝি শ্রীমদ্ স্বামীজীর সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। আমরা যথাসময়ে গ্রাহকগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারি না বলিয়া মলয়ার বহুল প্রচার এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আশা করি এখন হইতে আর পুস্তকের অভাব হইবে না।

ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইবার সময় ২য় খণ্ড মলয়া শীঘ্রই বাহির হইতেছে বলিয়া লিখা হইয়াছিল। মলয়ার ২য় খণ্ড বাহির হইয়াছে। স্বামীজীর সাধনার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সব সঙ্গীত লিখিতেন, প্রিয়ভক্ত কবিগুণাকর আপ্তাবদ্দিন তাহা সুর, তাল, লয় যোগে গান করিয়া স্বামীজীর মনোরঞ্জন করিতেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী বিভোর হইয়া সে গান শুনিতেন। আপ্তাবদ্দিনের মুখে শুনিয়া চারিদিক হইতে তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল। মলয়ার ১ম খণ্ডে তাঁহার কতক গান দেওয়া হইয়াছে, ২য় খণ্ডেরও অনেক গান বহুলোকে জানে। শীঘ্রই তৃতীয় খণ্ড বাহির করিবার চেষ্টায় আছি। স্বামিজীর প্রায় সহস্রাধিক গান, আশা করি ৫ম খণ্ডে সম্পূর্ণ করিতে পারিব।

এতদ্ভিন্ন স্বামীজী সাতিশয় সুন্দর ও গভীর ভাবব্যঞ্জক প্রায় ১০০০ হাজার কবিতাপূর্ণ 'তপোবন' 'উপবন' 'নির্ম্মাল্য' নামে তিনখানা কাব্য গ্রন্থ, 'প্রেম ও

প্রীতি' 'পথিক' 'সত্যশতক' 'আলেয়া' 'ময়না বা পাগলের প্রলাপ' "যোগ-প্রণালী' 'পাথেয় বা সঙ্গের সম্বল' ও 'খনি'— আত্মতত্ত্ব সাধনে সরল রহস্যপূর্ণ এই কয়খানা এবং "সর্ব্বধর্ম্ম তত্ত্বসার' নামে অতি জটিলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অতি সহজ বোধগম্য সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সহ প্রকাণ্ড পুস্তক লিখেন। তন্মধ্যে 'ময়না বা পাগলের প্রলাপ', 'পাথেয় বা সঙ্গের সম্বল' 'পথিক' ও 'যোগ-প্রণালী' নামে চারিখানা বহি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে ... ... ।

নানা প্রকার ব্যয় বাহুল্যবশতঃ আমরা মলয়ার মূল্য দুই আনা বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ ইহাতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সকলে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিলে এবং সাধারণের অনুগ্রহ পাইলে অন্যান্য গ্রন্থগুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। কিমধিকমিতি।

আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, কুমিল্লা
১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

বিনীতা
সৌদামিনী দত্ত
প্রকাশিকা

আমার নিবেদন

নিবেদন-নিবেদন। এই গ্রন্থ রচয়িতার সবগুলি গান-ই স্রষ্টার উদ্দেশে নিবেদিত। আমারও নিবেদন পরমের চরণে তথা মলয়া ও রচয়িতার সদনে। সবশেষেও যে সত্তা থাকে সেই সত্তার সাথে রচয়িতার সংযোগ সত্তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

এই গ্রন্থ রচয়িতার কবিত্ব, অধ্যাত্ম চেতনা এতই প্রখর ছিল যে, তিনি মুক্তারী পরীক্ষার খাতায় আইনের বিবরণ না লিখিয়া– লিখিয়া দিলেন কয়েকটি গান। অসংসারি ভাব মহর্ষি মনোমোহনকে ভাবের অতল তলে নিয়া গিয়াছিল। মলয়ায় তিনি স্রষ্টার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ধর্মে সমন্বয় ভাবনার ভাবচিত্র চিত্রিত করিয়াছেন।

সমন্বয়মুখীন দৃষ্টিভঙ্গিতে মলয়ার কবি পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সাধনার পদ্ধতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি জগত ও জীবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১০ মাঘ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২৪ জানুয়ারি ২০০১।

ইতি
শ্রীসুধীরচন্দ্র দত্ত

বিংশতিতম মুদ্রণ

আমার কথা

'মলয়া'র স্রষ্টা মরমী সাধক মনোমোহন আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন 'দয়াময়' নামের অবতার ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ কালীকচ্ছ নিবাসী শ্রী আনন্দচন্দ্র নন্দী বা মহারাজ আনন্দ স্বামীর কাছ থেকে। মনোমোহন গুরুর আদেশ হৃদয়ে ধারণ করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কঠোর সাধনার মধ্যদিয়ে নিজেকে 'মনের মানুষে' পরিণত করেন। গুরুগৃহে সাধনার এক পর্যায়ে মহারাজ আনন্দ স্বামী মনোমোহনকে বলেছিলেন '... তুমি কি চাও' ? মনোমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, '... আমি যেন আত্মহারার ন্যায় বলিয়া উঠিলাম– "নিষ্কাম ধর্ম।" স্বামীজী উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন– "নিষ্কাম ধর্ম ? ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়- যা হক্ অদ্য হইতে তোমার মনে যে সকল কথা জাগরিত হয় তাহা লিখিয়া রাখিও।" মনে ভাবিলাম আমার একটা মনই বা কি, কি কথা আবার উঠিবে-কিবা লিখিব।' মনোমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে আবারও বলেছেন "... ১৩০৩ সনের শ্রাবণের প্রথম ভাগে একদিন অল্প বেলা থাকিতে একটা বাঁশ হেলান দিয়া শূন্যপানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, হঠাৎ হৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং তাহা হইতে ছন্দোবদ্ধ পদ বাহির হইতে লাগিল–আনন্দে বিভোর হইলাম।"

নাথ ! তোমা বিনে এ ভব ভবনে
যত কিছু কিছু নয়
তুমি মূলাধার সর্ব সারাৎসার
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডময়।

এই পদই প্রথম আসিল ; তাহার পর ক্রমে সম্পূর্ণ একটি কবিতা হইল, ইহাতে আমি কি যে হইয়া গেলাম তাহা আর বলিতে পারি না। ... "প্রাতঃকালে জাগিয়াই আবার ছন্দোবদ্ধ পদ আসিতে লাগিল–পরমানন্দে বিভোর হইলাম, হৃদয় নাচিয়া উঠিল, কারণ সময়ানুযায়ী মনের ভাব, প্রাণের আবেগ কবির ভাষায় প্রস্ফুটিত হইলে কি যে এক অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় মন বিভোর হইয়া যায় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ

বুঝিবার কথা নহে। এইভাবে ক্রমেই কবিতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন নাই, রাত নাই, সময় অসময় নাই, সকল সময়ের জন্য বুদ্বুদের ন্যায় নূতন নূতন ভাব জাগিতে লাগিল; আর ভাবানুযায়ী ছন্দোবদ্ধ পদ আসিয়া আমাকে পরমানন্দ লহরীতে লইয়া খেলাইতে লাগিল, প্রায় এক দেড় মাস পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও যেন বিরাম পাইলাম না। অবিরাম স্রোত হৃদয়ে ছুটিয়াছে, ক্রমে কিছুটা কমিয়া আসিল। স্বামীজীর নিকট লিখিলাম, তিনি আশ্বাস দিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন।"[১]

এ ভাবেই মলয়ার গানগুলি রচিত হয়েছিল। কারো সঙ্গে পরামর্শ করে কিংবা দু'জন বা তিনজনে একত্রে বসে গানগুলো রচিত হয়নি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কোনো কোনো ব্যক্তি তাঁদের লেখায় কিংবা বক্তৃতায় 'মলয়া' নামকরণের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের মতে মনোমোহন-এর 'ম', লবচন্দ্র পালের 'ল' এবং আফতাবউদ্দিন এর 'আ' অর্থাৎ তিনজনের নামের আদ্যাক্ষর নিয়েই নাকি বইয়ের নামকরণ। এ তথ্য তাঁরা কোথায় পেলেন আমি জানি না। মনোমোহন সাধু এ সম্পর্কে কোথাও কিছু বলেননি-বলার কথাও না। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, অধ্যাত্মজগতের ভাবনা কি তিনজনে একত্রে শেয়ার করা যায় ? একত্রে কি একটি কবিতা লেখা যায় ?

মনোমোহন শিষ্য লবচন্দ্র পাল বা ফকির আফতাবউদ্দিনও এ সম্পর্কে কিছু লেখেননি বা দাবি করেননি। মনোমোহন-এর তিরোভাবের পর তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী দত্ত সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এ সময় লবচন্দ্র পাল, ফকির আফতাবউদ্দিন, প্রিয় শিষ্য নিশিকান্ত সেন নিয়মিত সাতমোড়া আনন্দ আশ্রমে যাতায়াত করতেন এবং সৌদামিনী দত্তকে 'মা' বলেই সম্বোধন করতেন। সেই সৌদামিনী দত্ত বা তাঁর একমাত্র পুত্র স্বামী সুধীরচন্দ্র দত্ত বা তাঁর স্ত্রী কমলারানী দত্ত যিনি শাশুড়ী সৌদামিনী দত্তের একান্ত কাছের মানুষ ছিলেন তাঁরাও কিন্তু এ -সম্পর্কে কিছু বলেননি বা লেখেননি।

মনোমোহন নিজে তাঁর বর্তমান 'মলয়া' গ্রন্থে একাধিক পঙ্‌ক্তিতে 'মলয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, মনোমোহন প্রায় সবগুলো গানেই কোথাও না কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও লবচন্দ্র পালের নাম উল্লেখিত হয়নি।

তবে আফতাবউদ্দিন এর নাম তিনি দু'একবার ব্যবহার করেছেন। যেমন – ২৭৮ সংখ্যক গানের শেষ লাইনে বলা হয়েছে – 'আপ্তাবদ্দীন দিশেহারা, বড় পেরেশান', অথবা আর একটি গানে – 'আপ্তাবদ্দীন নিরুপায়, মুরশিদ কহিছে তায়'। আমাদের মনে রাখতে হবে ফকির আফতাবউদ্দিন ছিলেন মনোমোহন এর অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। 'মলয়া'র প্রতিটি গানে তিনি সুরারোপ করেছেন, তাল নির্দেশ করেছেন। কেবল তাই নয় – তিনিই গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের মাঝে মলয়া সঙ্গীত পরিবেশন করে মলয়া

১. লীলা রহস্য, (ঢাকা-১৪১২) পৃ. ৫৯-৬০

এবং তার স্রষ্টা সাধক কবি মনোমোহনকে জনপ্রিয় করেছেন। সাধক মনোমোহন এর প্রতি কতটা শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকলে পর জগতখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফকির আফতাবউদ্দিন সবকিছু ত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে মলয়া সঙ্গীতকে সুরের মায়াজালে সিক্ত করে ভাব জগতের গূঢ় জটিল তত্ত্বকে জনসাধারণ্যে উপস্থাপন করতে পারেন।

মনোমোহনের তিরোভাবের পর তাঁর প্রিয় ভক্ত-শিষ্য লবচন্দ্র পাল এবং নিশিকান্ত সেন গুরুর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ 'মনোমোহন' রচনা করেন। এই গ্রন্থেও কিন্তু তাঁরা 'মলয়া'র নামকরণ বা এর সঙ্গে লবচন্দ্র পালের কোনো প্রকার সম্পৃক্তির কথা উল্লেখ করেননি।

পরবর্তীতে লবচন্দ্র পাল আনন্দ্রচন্দ্র নন্দী বা মহারাজ আনন্দ স্বামীর জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ 'শ্রী শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উল্লেখিত গ্রন্থে লবচন্দ্র পাল নিজেই বলেছেন : "..... এই মহাপুরুষের [মনোমোহন] শক্তি সঞ্চারের ভিতর দিয়াই আপ্তাবদ্দিন দেশ বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু যন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। ..... সকলে তাহাকে খাঁ সাহেব উপাধি দিয়াছিল এবং সকলের নিকট তিনি প্রফেসার আপ্তাবদ্দিন বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন"[১]

একই গ্রন্থে লবচন্দ্র পাল মনোমোহন সম্পর্কে আরও লিখেছেন :

" ..... তিনি শ্রীআনন্দ মহারাজের একমাত্র শিষ্য, যাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে গুরু শিষ্য উভয়ে পরামর্শ করিয়াই ধরাতলে আসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মহাপ্রয়াণ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের করুণাতে আজও রহিয়াছি। তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ অনেক আছে। তন্মধ্যে 'মলয়া' (সঙ্গীত গ্রন্থ) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ময়না বা পাগলের প্রলাপ, পথিক এবং পাথেয় এই কয়খানাই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন, তাঁহার লিখিত কবিতা কিংবা সঙ্গীত পাঠ করিলে মনে হয় যেমন মহাগ্রন্থ 'কোরাণ' স্বর্গীয় দূত জিব্রাঈল (জেব্রিল?) কর্তৃক বিবৃত হইত, তাঁহার কবিতাও কোনো অজ্ঞেয় পুরুষের অমৃত উৎস হইতেই প্রবাহিত হইত"[২]

যারা 'মলয়া' পাঠ করেছেন বা দেখেছেন – তাঁরা নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছেন – মনোমোহন তাঁর গানগুলির বিভাজন করেছেন এভাবে – 'সর্বধর্ম সঙ্গীত', 'স্বরূপ নির্ণয়', 'শ্যামা সঙ্গীত', 'কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত', 'শিব সঙ্গীত', 'গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক সঙ্গীত', এবং 'ইসলামবিষয়ক সঙ্গীত'। সঙ্গীতের এক একটি বিভাজন বা ধারার

১. লবচন্দ্র পাল, শ্রী শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, (ঢাকা ১৪০০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন) পৃ. ৫৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

মধ্যদিয়ে এক একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বকে তিনি উপস্থিত করেছেন ভাবরাজ্যের ভাবুক মনে। এই যে এক একটি ভাব রাজ্য, এই ভাব রাজ্যে কি ভাবের মানুষ না হলে, সুগভীর তত্ত্বীয় জ্ঞানের অধিকারী না হলে, ঐশী শক্তি অধিকারী না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে কি এ জাতীয় সঙ্গীত রচনা সম্ভব ?

আমি আশা করি যাঁরা 'মলয়া' নামের ব্যাখ্যা করে এ যাবত বিভ্রান্তিতে ভুগছেন তাঁরা পথের দিশা পাবেন। বিতর্কের অবসান ঘটবে। কোনো ভুল বা মিথ্যার ওপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যা সত্য– তা সকল ধর্ম, মত ও পথের অনুসারীদের জন্যও সত্য।

'মলয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বর্গীয় উদ্যান, নন্দন কানন, স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস। আমরা যদি গানগুলিকে স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস বলি – যা মানুষকে নতুন জীবনের সন্ধান দেবে – তাহলে কি ভুল বলা হবে ?

মনোমোহন সহধর্মিনী সাধ্বী সৌদামিনী দত্তের তিরোভাব দিবসে আমাদের বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্তমান সংস্করণটি। এই মহীয়সী নারী মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে স্বামীজীকে হারিয়ে এক বৎসর বয়সী শিশু সন্তান আমার পিতৃদেব শ্রী সুধীরচন্দ্র দত্তকে বুকে নিয়ে সমগ্র জীবনব্যাপী স্বামী প্রদর্শিত সমন্বয়বাদী ধারাকে সমুন্নত রাখতে, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, লড়াই চালিয়ে গেছেন। সমাজের কাছে, ব্যক্তির কাছে, কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করেননি তিনি। এই অসাধারণ বিরল নারীকে আমি প্রণতি জানাই।

বর্তমান সংস্করণ মুদ্রণ এবং প্রুফ সংশোধনসহ গ্রন্থের যাবতীয় কাজই সম্পন্ন করেছেন মনোমোহন অনুসারী ড. সুকুমার বিশ্বাস। প্রার্থনা করি, দয়াময় যেন তাঁর মঙ্গল করেন। এ কাজের সঙ্গে কল্যাণী ও মনোরঞ্জন গুহ, শিখা বিশ্বাস, জয়দেব বর্মণ, আনন্দ দেবনাথ, এস. এম. মাসুম ভূঁঞা এবং তপন দাশ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। দয়াময়ের আশীর্বাদ তাদের ওপর বর্ষিত হোক।

আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয় – এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। জয় দয়াময়।

দীন সেবক
বিল্বভূষণ দত্ত

আনন্দ আশ্রম,
সাতমোড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
২৩ আষাঢ় ১৪১৩।

একবিংশতিতম মুদ্রণ–
প্রসঙ্গ কথা।

মহর্ষি মনোমোহন রচিত 'মলয়া' গ্রন্থের কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কারণ মলয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি গ্রন্থটিকে মলয়া বা সদ্ভাব সংগীত হিসাবে নামকরণ করেছেন।

মহর্ষি তাঁর সর্ব্বধর্ম্মের সাধন-লব্ধ তথ্য, ধ্যানলব্ধ অমূল্য ভাবরাশি, সাধারণ এবং ভাব জগতের জীবের কল্যাণে সংগীতরূপে রেখে গিয়েছেন। এই সংগীত ভাব জগতের জন্য অপরূপ ও অনন্য। ইহা উপমহাদেশের জন্য বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও এক অনবদ্য সৃষ্টি, সকলেরই জানা।

অতি অল্প সময়ে এবারকার একবিংশতিতম সংস্করণটি প্রকাশ করতে গিয়ে মুদ্রণ ও প্রুফ সংশোধনের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করেছেন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রী ননী গোপাল সেন (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব)। এ কাজে বিশেষ উদ্যোগী দয়াময় ভক্তবৃন্দ- শ্রী চূনীলাল সাহা (নারায়ণগঞ্জ), আনন্দ দেবনাথ ও জয়দেব বর্মন এর নাম উল্লেখযোগ্য। দয়াময়ের আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হোক।

আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ-জনিত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়- এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। জয় দয়াময়।

আনন্দ আশ্রম,
সাতমোড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
২৩ আষাঢ় ১৪১৯।

দীন সেবক
বিল্বভূষণ দত্ত
কর্মাধ্যক্ষ।

গাঁথা

(১)

নানা মত নানা পথ, বিভিন্ন স্বভাব,
মানব হৃদয় ভরা, অসংখ্য অভাব,
সকলের মূলে সত্য, নিত্য এক ভাব,
যাঁহারে পাইলে হয়, নিত্যানন্দ লাভ।

(২)

নাহি তাতে ভেদাভেদ অহিংসা অভেদ,
কোরাণ পুরাণ আদি, বাইবেল কি বেদ,
সবে ফুঁকারিয়া কয়, ভাব অবিচ্ছেদ,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়, রবে না বিচ্ছেদ।

(৩)

কোলাহল, কোলাহল, শুধু হলাহল,
অমৃত কররে পান, ছাড়িয়া গরল,
বুঝ নিত্য ভাব সত্য, হইয়া সরল,
পরমাত্মা, পরব্রহ্ম আত্মাই কেবল।

(৪)

অখণ্ড মণ্ডল ব্যাপী, চিদানন্দরয়,
যাঁহারে পাইলে প্রাণে, নিত্যানন্দ হয়,
ভাব সে আনন্দ পদ, মানব নিচয়
আনন্দ বদনে বল "জয় দয়াময়।"

সূচিপত্র

সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্গীত

রাগিণী গৌর সারঙ্গ – তাল ধামাল।

জয় সত্যং শিব সুন্দর, রূপ মনোহর,
বিশ্বজন বন্দন, দয়াময় বিশ্বেশর,
অরূপ রূপ জাতি,
শুভ্র জ্যোতি,
নাশি তমঃ রাশি, ঘোর নিবিড় আঁধার।
প্রকাশিল পূর্ণ কান্তি, কোটী শশী দিবাকর।
যত মানুষ মানুষী,
হয়ে খুসী,
চির বিকশিত, প্রফুল্ল কুসুম রসে –
হরষে মজিল, ঘুচিল মরণ দুর্ণিবার। ১ ৷৷

সর্ব্ব ধর্ম্ম দয়াময় নাম।

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঝাঁপতাল।

ধন্য ধন্য "দয়াময় নাম" শ্রী আনন্দ অবতারে।
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে, জীবন্মুক্তি এল দ্বারে।
অন্য যত অবতারে,
কাহারে কাহারে তারে,
ধন্য দয়াল অবতারে, যারে, তারে, তারে তারে।

পড়িয়ে ভবপাথারে,
হেলায়ে ডাকিলে তাঁরে,
মিলয়ে মমতা করে, ত্বরায়ে তারিতে তারে।
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে,
সে ভাবে সে পাবে তাঁরে,
কেহ যারে নাহি তারে, সে তাহারে তারে তারে।
মোহ মৃত্যু ব্যাধি ঘোরে,
দয়াময় নামে তারে,
চিদানন্দ–সিন্ধুনীরে, প্রেমানন্দ কেলি করে।
মনোমোহন মন তারে,
নিয়ত ভাবিছে তাঁরে,
অযাচিত হৃদিদ্বারে, করুণা দেখি কাতরে। ২ ৷৷

রাগিণী কানেড়া মল্লার – তাল কাওয়ালী।

তোমারি মহিমাগুণ, গাহিব পূরবী তানে।
ভৈরবী ভৈরব রবে, ব্রহ্মরুদ্র তালমানে।
ললিত পঞ্চম স্বরে,
বেহাগেতে প্রাণ ভরে,
দীপক বাগেশ্রী রাগে, মাতিব হে তব গানে ৷৷
ঝিঁঝিটে পূরিয়া তান,
গাহিব তোমারি গান,
বসন্ত খাম্বাজ আদি, – কানেড়া কেদার সনে। ৩ ৷৷

রাগিণী গাড়া ভৈরবী – তাল মধ্যমান ঠেকা।

বীণা কি গাহিতে জানে গান।
বীণাপাণি বীণার তারে না ধরালে তান।
ভাব কিলো সই আপ্‌নি ফুটে, ঢেউয়ের চোটে উথ্‌লে উঠে।
না গেলে পর প্রাণ ছুটে, ধরা কি দেয় প্রাণ ॥
বাজরে বাজরে বীণা, সুরতান লয় মূর্চ্ছনা,
চতুরঙ্গ খেয়াল টপ্পা, করিয়ে সন্ধান ॥
ঝঙ্কারিয়ে তব তার, জয়দেব তুলসী আর
তান্‌সেন ব্রজবাউরা, সুরদাস জ্ঞান ;
হৃদিপদ্ম ফুটাইয়ে, গিয়েছে মধু লুটিয়ে,
ভববন্ধন কাটীয়ে, যত অমর সন্তান।
সাধ্য ছাড়া সাধ লয়ে, আমিও এসেছি ধে'য়ে,
বীণাপাণি এ হৃদয়ে, হয়ে অধিষ্ঠান –
তোমার বীণা তুমি করে, লয়ে বাজাও দয়া করে,
মধুর মধু ঝঙ্কারে, মোহ করি প্রাণ।
নির্গুণ হইলে ছেলে, মা কি দেয় কোল্‌হতে ফেলে,
মনোমোহন তাই বলে, সুর তাল মান –
যদিও না আছে বশে, মত্ত হ'য়ে তবুও সে,
বীণার তার মেজে ঘ'সে আরম্ভিল গান।
চাপ্‌লে কি রয় মুখের হাসি, আপ্‌নি বাজে ভাবের বাঁশী,
প্রাণ উদাসী তাইতো আসি, মান অপমান –
মদ্ মাতালে মন মাতালে, ধর্‌তে নারে কোন কালে,
ঢেউয়ের তালে তারা খেলে, ভাটী আর উজান। ৪ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী – তাল মধ্যমান।

তিন্ তারের এক বীণা আছে।
নিজ করে বীণে, ধরিয়ে ত্রিগুণে, আপ্‌নি আপন বাজাইতেছে।
যন্ত্র মুখে তার, আছে মন্ত্র ভরা, বেদ বিধি শাস্ত্র, তন্ত্র গ্রন্থ ছাড়া,
সদা রন্ধ্র মূলে, খেলে কুতূহলে, হংস হংস ব'লে ডাক্‌তেছে।
তারে তারে তারে দিতেছে ঝঙ্কার, সঙ্গে সঙ্গে তার বায়াত্তর হাজার
বাজে মূলাধার, বাজে সহস্রার, বহুরূপী তায় আনন্দে নাচে।
বাজে কত তাল, খেম্‌টা খেয়াল, ব্রহ্মরন্ধ্র পট, আদ্ধা চৌতাল,
সুরতাল রঙ্গে ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে হাস্‌তেছে।
কখন কান্দে, কখন কেন যেন হাসে, শিশুর অধরে সে নিশানা ভাসে,
মনোমোহন তার, মন অভিলাষে, তাঁহারি তালাসে, ছুটিয়াছে।
এ যন্ত্র সাধনা, কে শিখায়ে দিবে, কোথা সেই যন্ত্রী, কে তারে ধরিবে,
সহজে সেই যন্ত্রে, জাগে যেই অন্ত্রে, অনুমান তন্ত্রে, যেয়ে পাছে পাছে।
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, উঠিলে মাতিয়া, হুঙ্কারে সে যন্ত্রী, আপনি জাগিয়া,
খেলিয়া, খেলিয়া, খেলা শিখাইয়া, হাসিয়া কান্দিয়া টেনে লয় কাছে। ৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল আড়াঠেকা।

বাজ্‌রে বাজ্‌রে বাজ্‌রে বীণে
তারে তারে মিশাইয়ে তার, সুতান তোল তানে তানে।
সে তারে মিশিলে তার, দেখ্‌তে পাবি চমৎকার,
অপরূপ রূপের ছবি, খেল্‌বে রে তোর দুনয়নে।
হৃদয় তারে মন বীণা, হরি ব্রহ্ম নাম জপ না,

দুঃখ যেয়ে সুখ উপজিবে, আনন্দ খেলিবে প্রাণে।
তারে তারে ধর্‌লে জিল, ঘুচিবে যত মুস্কিল,
তারের খবর আস্‌বে তারে, শুনতে পাবি ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়াঠেকা।

ধীরে ধীরে আঁখিনীরে, কি জানি কি কথা কয়।
সপ্তস্বরে তিন গ্রামে, অনাহত ধ্বনি হয় ॥
আঁখিতে সঙ্গীত গায়, হৃদিযন্ত্র বাজে তায়,
হাওয়াতে প্রাণ খেলে বেড়ায়, প্রকৃতি মাধুরীময়।
উদারাতে প্রেমের ঝঙ্কার, মুদারাতে ধরে বিকার,
তারা গ্রামে বাজিলে তার, ত্রিবেণী উজান বয়।
সপ্তস্বরে বাজে বীণা, সঞ্চারিয়ে তা, না, না, না,
সুরতান লয় মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছ নাতে মূর্চ্ছা হয়।
তার পরে তার খোলে আঁখি, একবিনে সব দেখে ফাঁকি,
উড়েগিয়ে প্রাণপাখী, ব্রহ্মপদে হয় লয়।
মনোমোহন কয় সন্ধানে, এ সেতারের তার কম্পনে,
মুক্তিপদ পায় মহাজনে, ভাগ্যফলে নইলে নয় ॥ ৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঝাঁপতাল।

শিখায়ে দে তুই আমারে, কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরা'য়ে দেইরে, জন্মভরার ডাকাডাকি।
যেমন করে ডাক্‌লে পরে,
শুন্‌তে পাস্ তুই হঠাৎ করে,

হাসি দিস্ আমার অন্তরে, প্রাণভরে যায় রয়না বাকী।
ডাক্ দিয়ে তুই ডাক্ শিখায়ে,
ফাক্ না দিয়ে, আয়না ধে'য়ে,
খেলাই আমি তোরে ল'য়ে তোর প্রাণে মোর প্রাণ মাখি।
যেরূপে তোর নয়ন ধরা,
সেরূপ ধরে নয়ন ধারা –
বারণ করি হওনা দাঁড়া, চেয়ে থাক্ দুই পাগ্‌লা আঁখি।
মনোমোহন বেহু'সার মন,
কম্‌তি পড়ে নাই তার ওজন,
আপ্‌নি কর তারে শোধন, হৃদয়ে জাগ্রত থাকি ॥ ৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ– তাল একতালা।

তাঁরে ডাক্‌তে জান্‌লে দিত দেখা, কইত কথা আমার সনে।
সে যে ডাক শুনেনা, কয়না কথা, বুঝ্‌লাম আমি ডাক জানিনে
ডাকার মত ডাক্‌ছে যারা, হয়না কভু তাঁরে হারা,
সে তারে দিয়েছে ধরা, যে ডে'কেছে আকুল প্রাণে।
শিশু যেমন মাকে ডাকে, জানেনা আর অন্য কাকে,
সুখে দুঃখে মা, মা, মা, মা, দেখেনা আর মা বিনে।
জলদে ডাকে চাতকে, ঝড় তুফান করকে,
প্রাণ গেলেও যাকে তাকে, ডাকেনা সে, সে বিনে।
বৃন্দাবনে ব্রজগোপী, রয়েছে যে ভাবে ডুবি,
সে ভাবে স্বভাব নিবি, বলে যত মহাজনে।
সে ভাবে স্বভাব নিতে, হলনা আর আমা হ'তে,
কামিনী কাঞ্চনে পথে, গোল বাজাইল হেছ্‌কা টানে।
ডাকার মত ডাক্‌লে পরে, রইতে কি সে পারত দূরে,

দেখা দিত সে আমারে, কইতাম্ কথা প্রাণে প্রাণে।
ডাকার মত ডাক জানিনে, তাই ত তার দেখা পাইনে,
শিশুর কাছে ডাক শিখেনে, মনোমোহন কয় ভেবে মনে ॥ ৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল লোভা।

ওরে মন বুল্‌বুল্ পাখী।
এ বোল্ সে বোল্ না বলিয়ে, দয়াময় নাম বল্ দেখি।
সদানন্দে আত্মারাম, বল কালী কৃষ্ণ নাম,
জ্ঞানে প্রেমে মত্ত হ'য়ে, তত্ত্ব ফলে চোখ রাখি ॥ **১০** ॥

রাগিণী আলেয়া – তাল খেম্‌টা।

হরি বলে ডাক্‌রে ও মন, গুরু বলে ডাক্।
দিবানিশি ভাবে বসি, চরণতলে প'ড়ে থাক্ ॥
পশু পাখী তারা ডাকে, প্রহরে প্রহরে জাগে,
তুমি মন লেপ তোষকে ঘুমের ঘোরে মার জাক্।
প্রেয়সীর সঙ্গে শুয়ে, কত ঢঙ্গে কথা ক'য়ে,
রঙ্গে দিলি রাত্ কাটায়ে, দিবসে তোর নাহি ফাক্।
জমি জমা বসত বাটী, ছেলের বিয়ের ফন্দি আটি,
কে কোন্ খানে ম্‌রছে খুটী, ভেবে ঘুর্‌বি মাটির চাক্।
টাকা পয়সা সোণার গয়না, দেখ্‌না কারো সঙ্গে যায় না,
যাবার কালে ছেড়া তেনা, তোড়ায় থাকে হাজার লাখ্।
মার্‌বে যখন দাঁত কপাটি, বাঁধ্‌বেরে তো খাটী পাটী,
লাগ্‌বে মাথা কুটাকুটী, হয়ে যাবে সকল খাক্।
তাই বলিরে মনোমোহন, আগে কর শেষের আয়োজন,
তুচ্ছ কথার নাই প্রয়োজন, হরি হরি বলে ডাক্ ॥ **১১** ॥

রাগিণী মিশ্রসাহেনা – তাল খেম্‌টা।

ডাক্ ডাক্‌রে কাঙ্গালের পাখী, ফাঁকি দিয়ে যাস্‌না উড়ে।
ডাক্ তুই একবার হরি বলে, প্রাণ ভরে মধুর স্বরে ॥
ডাক্ ডাক্ ডাক্ ডাক্‌রে পাখী, আমার হৃদয়ে থাকি,
চেয়ে থাক্ দুই পাগল আঁখি, রূপে রূপ নেহার করে।
পাখীরে তোর পায়ে পড়ি, শিক্‌লি কেটে যাস্‌নে উড়ি,
রাধাকৃষ্ণ বদন ভরি, বল্‌রে শুনি প্রাণ ভরে।
শুন্ তোরে কই আত্মারাম, শুধায়ে দে হরি নাম,
তোমার আমার পরিণাম, সুধাময় হ(উ)ক একেবারে।
তুইরে আমার প্রাণ পাখী, দিস্‌নে ফাঁকি প্রাণে থাকি,
আকুল হ'য়ে তোরে ডাকি, রাখিব যতন করে।
পাখী আমার ময়না তোতা, কইতে চায় না আমার কথা,
চলে যায় সে এথা সেথা, মনোমোহন ঠেকেছে ফেরে ॥ **১২** ॥

রাগিণী টোরী – তাল আড়া।

ডাক্‌লে যে জন দেয় না সাড়া, কি হবে আর তারে ডে'কে।
সুখে থাক্ তুই আপনা ভাবে, যেমন আছিস্ তেমন থেকে।
কেন্দে কেন্দে হ'লে সাড়া, যে মুছায় না অশ্রুধারা,
ভয় পেলে যে নেয় না কোলে, কাজ কি আছে দিয়া তাকে।
পোড়া প্রাণ জুড়াইতে, ডাকি তায় আকুল চিতে,
সে চায় না ফিরে রয় তফাতে, এমন জনে কেবা ডাকে ॥ **১৩** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

আমি ভুলি না তোর ফাঁকা ডাকে।
চিরদিন তারি আমি যে আমারি তাকে থাকে ॥
(যেমন) বিলাতি – ফটোগ্রাফি, আয়নার সাজে ঢাকা ছবি,
তেমন ক'রে আছি আমি, ভক্তজনার প্রাণে জেগে।
কপট অনুরাগে, ভুলিনা কারো ডাকে,
সত্যই যার প্রাণে চায়, তার প্রাণে রয়েছি জে'গে।
ভক্ত আমার হৃদয় মন, আমি ভক্তের হৃদয়ের ধন,
কহিছে মনোমোহন, আপ্‌নি আছেন আপন ঢেকে ॥ **১৪** ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ – তাল একতালা।

ডাক দেখি মন ডাকার মত।
ডাক শুনে সে আসে কিনা দেখ্‌বরে তার দয়া কত ॥
ভক্তিভরে মধুর স্বরে, ডাক্‌দেরে তায় প্রাণ ভরে,
না এ'সে কি থাক্‌তে পারে, তারি প্রাণ ভক্ত গত ।
আকুল প্রাণে ডেকে তাঁরে, কে কবে গিয়াছে ফিরে,
ভক্ত বৎসল দয়া করে, দেখ্‌লে পরে অনুগত ॥ **১৫** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল খেম্‌টা।

তাঁরে কাছে ডেকে আন্‌, তাঁরে কাছে ডেকে আন্‌।
যাঁরে দেখ্‌লে জুড়ায় পোড়া আঁখি, ডাক্‌লে জুড়ায় প্রাণ।
ভক্তি ভরে মধুর স্বরে, তাঁরে কাছে ডেকে আন্‌
চখের জলের বাধন দিয়ে, তাঁরে কাছে ডেকে আন্‌।
ডাক্‌দে ডাক্‌দে তারে মমতা মাখিয়া সুরে,

শিশুর মত মা, মা, করে, যে সুরে হয় প্রাণ জুড়ান্‌।
নয়ন রেখে রূপের পানে, টেনে ধর আঁখির কোণে,
প্রাণ সপিয়ে প্রাণের টানে, জাগাইয়া তোল প্রাণ্‌।
চাঁদে চাঁদে মিশামিশি, ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি,
মনোমোহন কয় ভালবাসি, যে হাসির আর নাই ফুরান্‌। **১৬** ॥

রাগিণী বসন্তবাহার – তাল ঝাঁপ্‌তাল।

নাম ধরিয়া ডাক্‌লে পরে, উত্তর কি তার পাওয়া যায়।
কথা কি সে কইতে পারে, প্রাণে যারে সদায় চায়।
কখন কি সে স্বরূপ ছেড়ে, আমার মতন হ'তে পারে,
সে আমি না হ'লে পরে, কিসে বা প্রাণ জুড়ায়।
বেদান্ত করে বিচার, অখণ্ড মণ্ডলাকার,
অনন্ত স্বরূপ তাঁর, ধ্যানে নাহি পাওয়া যায়।
বিফল প্রয়াস তবে, তারে কোথা পাওয়া যাবে,
ভাবুকে কেবল ভাবে, ভাবে যাঁরে পাওয়া যায় ॥ **১৭** ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল খেম্‌টা।

হরি বলে ডাক্‌রে ও মন ভক্তি ভরে মধুর স্বরে।
ডাক্‌লে হরি দিবেন দেখা, বড় দয়াল ভক্তের তরে ॥
শিশু বৎস হাম্বা ক'রে, ডাক্‌লে মা থাক্‌লে দূরে,
ছুটে আসে অম্‌নি ক'রে, বৎসের ডাকে দুগ্ধ ঝরে।
তেম্‌নি হরি ভক্তের ডাকে, রইতে নারে আর গোলকে,
ভক্ত হৃদয় প্রেমালোকে, হাসায়ে হাসেন অন্তরে।
এক প্রাণে জগত প্রাণ, বাঁধা আছে অম্‌নি সন্ধান,
আকুল হ'লে ভক্তেরি প্রাণ, সে তান বাজে তাঁর ভিতরে।

তানে তানে পড়িলে টান, প্রাণেতে মিশে যায় প্রাণ,
ভক্ত হ'য়ে যায় ভগবান, জগত ভরা একরূপ ধরে।
হ'লে আত্ম সম্প্রদান, করেন হরি আত্মদান,
দূরে যায় তার মান অভিমান, এক আত্মা কে ভেদ করে।
সেরূপে স্বরূপ মিশে, দিবানিশি খেলায় হেসে,
আলোকে আঁধার নাশে, হৃদে ভাসে হরে হরে।
মনোমোহন বড় বোকা, গেল না তার মনের ধোকা,
সোজা পথে হ'ল ঠেকা, একা সে যাইতে নারে ॥ ১৮॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

থাক্‌লে সেত ডাক্‌লে দেখা দিত আমারে।
নাই ব'লে সে মোর মনে হয়, যে যত কয় ধাঁধায় প'ড়ে ॥
যে যত কর্‌তেছে গণ্য, সবার মান্য ভিন্ন ভিন্ন,
বিচার করে পাপ পুণ্য, অরণ্যে ভ্রমণ করে।
ছিলি শূন্য, হবি শূন্য, মিছে দুই চার দিনের জন্য,
হিসাব করে পাপ পুণ্য স্বভাবে ঠেকেছ ফেরে।
ভাব্‌ছ ব'সে তুমি তুমি, আমি ভিন্ন কইবা তুমি,
আমার আমি সেও তুমি, তুমি বলে কে কয় কারে।
স্বভাব ছাড় স্ব-ভাব ধর, আমার আমি নির্দ্দেশ কর,
সাধন সিদ্ধি এই তোমার, আর যত বিপাকে ঘুরে ॥ ১৯ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

নাম লইয়ে ডাকা তারে কেবলই বৃথা।
সাধনার মূল তত্ত্ব, শুধু চিত্ত একাগ্রতা ॥
আমি তুমি যোগ ধ্যান, সাধনে সত্য বিধান,

ডাকাডাকি, হাকাহাকি, কেবলই কথার কথা।
চিন্তাতে মিশিলে ভাব, খোলে সে নিজ স্বভাব,
অভাব পূরণ হ'য়ে যায়, যত সব ব্যথা ॥ ২০ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ তাল – একতালা।

পোষ মানে না জঙ্গ্‌লা পাখী।
(সে যে) এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, আমারে দিয়ে ফাঁকি।
স্বভাব দোষে হ'য়ে পাজি,
খেলায় সদা ভোজের বাজী,
সেত কথা লয় না, পাগল ময়না, কেমনে মানা'য়ে রাখি।
বল্‌তে চায় না রাধাকালী,
কর্‌ছে কেবল তালিবালী
তার ভাবে সে ঘুরে সদায়, আমার ভাবে আমি থাকি।
কামকামিনী পাখা ভরে,
স্বকাম হাওয়াতে উ'ড়ে,
চলে যায় দিগ্‌দিগন্তরে, ফিরে চায় না যদি ডাকি।
পাখী যখন লয় না পড়া,
এবার বুঝি ডুব্‌ল ভরা,
মনোমোহন ভেবে সারা, সদায় ঝরে দু' আঁখি ॥ ২১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

হ্যারে মন হর্‌বোলা পাখী।
হরি বল্ বোল্ না বলিয়া (কেবল) আবোল্ তাবোল্ বল্‌তে সুখী।
যে বোলে নাই মূলেই রস, তাতেই মন হয়েছ বশ,
সঙ্গে ফিরে আর জন দশ, আমার সঙ্গে কেও নাই দেখি।

আমার খায় আমার পড়ে, থাক্‌তে চায় না আমার ঘরে,
খেটে মরে পরের তরে, আমারে দিয়া ফাঁকি।
হর্‌বোলা তুই বল্‌রে হরি, এবোল সেবোল পরিহরি,
কেটে যাবে কর্ম্ম ডুরি, সদানন্দে রবে সুখী।
নিমিষার্দ্ধ নাই তোর বারণ, শেষের সেই দিন ক'রে স্মরণ,
মন নিয়ে মনোমোহন, ঠেকেছে দায় করে বা কি ॥ ২২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল লোফা।

আমার মন পাখি মিশিতে চায়, যেয়ে ঐ সব পাখীর দলে।
যেসব পাখী, ফাঁকি দিয়ে, ঘুরে বেড়ায় বন জঙ্গলে ॥
কত ক'রে করিরে মানা, পাখীরে বাসা ছেড় না,
সে আমার কথা শুনে না, তার সনে পারি না বলে।
শিক্‌লি কে'টে ময়না টিয়া, অই সব পাখীর দলে গিয়া,
আবোল্ তাবোল্ বোল্ বলিয়া, হারা হ'তে চায় মূলে।
হারেরে জঙ্গ্‌লা পাখী, আর তুমি দিও না ফাঁকি,
মনোমোহনের মন আঁখি, কেম্‌নে রাখি উল্‌টা চলে ॥ ২৩ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল খেম্‌টা।

বুঝে বুঝ্‌লি না তুই মন্‌রে কাণা।
বাজে খরচ ক'রে কেবল হারাইলি ষোল আনা ॥
যা ছিল তা নিল টেনে, কাম কামিনী মদন বাণে :
আরো যা ছিল বিষয় গুণে টান্‌তেছে বিপর্য্যয় টানা ।
শুন্ বলি ও আমার মন, ঠিক্ থাকে না তোমার ওজন,
কামিনী আর পেয়ে কাঞ্চন আহ্লাদে হলি আট্‌খানা।

চল্লিশ সেরে ঠিক হয় কাটা, বুঝিস্ না তুই পাগ্‌লা বেটা,
ঘুচায়ে দে সকল লেঠা, ওজন হ'য়ে ষোল আনা।
মনের গুণে মনোমোহন, পেলে নারে গুরুর চরণ,
গুরুদত্ত অমূল্য ধন, হ'ল কেবল কাণে শুনা ॥ ২৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

শুন্ বলি বাউলের মন। (চেতরে বাউলের মন)।
দেখে ধান্দাবাজী, হ'য়ে রাজী, কার্‌সাজী কর বারণ ॥
ঘোড়ারে লাগা'য়ে জিন্ চোরায় দৌড়ায় রাত্র দিন,
দিনে দিন ফুরাল দিন, এক দুই তিন ক'রে গণন।
বদ্‌রঙ্গে হ'য়ে বেদিশে, বিন্তি কাবার দিলি দশে,
ফাক্কা রঙ্গে, অবশেষে হবে না তোর খেলা রাখন।
দুগ্ধের সর গাভীতে খায়, একবার খেয়ে আবার চায়,
সাপ দেখিয়ে ময়ূর পলায়, ভেকে চায় করিতে ভক্ষণ ।
লাল ডিঙ্গি নঙ্গর করে, ঘোড়ার পিঠে বস চ'ড়ে,
অনুরাগের বল্‌গা ধরে, রূপের ঘরে রাখ নয়ন।
রেকাবীতে ঠিক্ রেখে পাও, মন তুমি ঘোড়া দৌড়াও,
যথা ইচ্ছা তথায় যাও, পাছে আছে মনোমোহন ॥ ২৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী

আমি কেমন করে বাধ্য করি মনমত্ত করীরে।
ভাবের ঘরে আন্‌তে তারে, অভাবে সংগ্রাম করে ॥
যোগমায়া শরজালে, বন্দি ক'রে নানা ছলে,
আপনি আপন খেলে, কুতূহলে ফন্দি করে।
ধর্‌তে গেলে না দেয় ধরা, কখন হাতী কখন ঘোড়া,

কখন শূন্যে করে উড়া, উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
কখন আগুন কখন পানি, কামে মত্ত দিন রজনী,
কলুর বলদ টানে ঘানি, চক্ষে ঠুলি চক্রে ঘুরে।
ভূতে ভূতে পেতে খেলা, ভেঙ্গে দিল সাধের মেলা,
মনোমোহনের কাঁধে ঝুলা, আর জানি কি আছে পরে ॥ ২৬ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী – তাল আড়াঠেকা।

কি করি বিপাকে পড়ি, হলেম এবার দু'মনা ॥
দুই দিক রাখা দায় হল মোর, কঠোর লাঞ্ছনা ॥
শুনিয়ে কালের ভেরী, কম্পিত দিবা সর্ব্বরী,
মনে করি চরণ ধরি, আর কিছুই চাহিব না।
কিন্তু হায় অপূর্ণ কাম, লভিতে না দেয় আরাম,
টানাটানি অবিরাম, ছাড়িয়ে সেত ছাড়ে না।
দু'মনে অধীর মনে, পাইব তোমায় কেমনে,
প্রতিকার কর এক্ষণে, ঘুচাইয়ে যন্ত্রণা ॥ ২৭ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল একতালা।

মনপাখী, বিপাকে পড়ে ঘু'র না।
(জে'ন) তাঁর ইচ্ছা বিনা ভবে, কিছুই যে হবে না ॥
যত আশা কর মনে, হবে না তাঁর ইচ্ছা বিনে,
দুরাশা ছাড়ি এক্ষণে, কর গুরুর চরণ সাধনা।
তুমি কি করিতে পার, নাহি আশার সুসার,
অসার সংসারে আর, ক'রো না মিছা ভাবনা ॥
যে করে তাহারে স্মরি, নির্ভয়ে চালাও তরী,

বৃথা হাবু ডুবু করি, হা হুতাশে কেঁদ না।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
পুতুল আপনা ভুলি, খেলিছে হ'য়ে খেল্‌না।
মনোমোহন জেনে শুনে, পারে না ত্রিগুণের টানে,
শক্তিহীন সাধনে, সার করেছে মন্ত্রণা ॥ ২৮ ॥

রাগিণী ভূপালী – তাল ঠুংরী।

ছাড় মন কুজন সঙ্গ রঙ্গ।
দিবা নিশি ভাবে বসি কর শ্রীপদ প্রসঙ্গ ॥
ছাড় মন কুবাসনা, কর গুরু উপাসনা,
যোগেতে ক'রে সংযোগ, ধর বিবেক করঙ্গ।
থাকিয়ে তাকে তাকে, ভক্তিপ্রেম অনুরাগে,
ফাঁদ পাতিয়ে ধর তাঁকে, ক'রো না রতি ভঙ্গ।
যে নাড়ী কে'টেছে তোর, সে নাড়ীতে মন চোর,
লাগায়ে ভকতি ডোর, জাগাও ত্রিভঙ্গ।
ধরিতে মনোমোহন, কর মন আয়োজন,
কহিছে মনোমোহন, ছাড় কুসঙ্গ রঙ্গ ॥ ২৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

শুন্ তোরে কই মনোমোহন।
তুই তিক্ত রসে লিপ্ত হলি ভুলে সুধার আস্বাদন ॥
জন্মাবধি করে এত, শিখ্‌লি না তুই শিখার মত,
মন হলি না মনের মত, আর কত ঘুরাবি মন ॥
সামান্য ধন পাবার আশে, ঘুর্‌লি কেবল হুস বেহুসে,

নিধন কালে, সেধন কি তোর, ধনের কাম দিবেরে কখন ॥
সাধ করে পেতে বিছানা, পু'ষেছ এক বাঘের ছানা,
সে যে রক্ত খেয়ে শক্ত হ'য়ে, নিল তক্ত সিংহাসন।
ফচ্‌কা বাঁধের হেচ্‌কা টানে, মন আমার ঠেকেছ প্রাণে,
বুঝ্‌লি না তুই দিন যে গণে, দিন দুনিয়ার মহাজন।
মন তোমার স্বভাব দোষে, আমি আমার মন মানুষে,
পার্‌লেম্ নারে রাখ্‌তে হুসে, কর্‌তে পূজা মনের মতন।
কই আমি মন তোমার কাছে, এখনও তোর সময় আছে,
ঠিক্ থাকিস্ তুই আগে পাছে, ঠিক রাখিস্ গুরুর চরণ ॥ ৩০ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল ঠুংরী

বারে বারে চাই যে আমি, মন্‌টী আমার দিতে তোরে।
হায় কি করি, দিতে নারি, প'ড়েছি এক বিষম ফেরে ॥
মন কেবল খেলায় চাতুরী,
তার সঙ্গীগুণে জোর দেখায়ে, আমি না পারি।
রংরাজে রংসাজে মজে, আছে বাজে কাজে বেহুইসারি ॥
মন আমার কথা শুনে না,
যে দিক ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, মানে না মানা।
কি করি, কেমনে তরি, ভবপারি সারি কেমন ক'রে ॥
আড়াল থেকে বাজায়ে বাঁশরী,
(সেত) মন কে'ড়ে নেয় লুকিয়ে থাকে, খেলে লুকোচুরি।
ধরি ধরি দেয় না ধরা, সেত ধরা দিয়ে যায় সরে ॥
পার্‌লেম্ না আর মনেরে বুঝাতে,
সে যে হিতাহিত নাহি মানে, মজে যাতে তাতে,
স্বভাব দোষে, মন বেহুসে, ঢুক্‌তে চায় না ভাবের ঘরে ॥

যে জন আমায় ধরিয়া টানে,
সেও খেলায় লুকোচুরি, মাতায়ে গানে,
দিতে গেলে নিতে চায় না, যদি ষোল আনার কম পড়ে ॥
মন পড়েছে বিমনের ফেরে,
মন নিয়ে মনোমোহন, বিপাকে ঘুরে,
সেত কোন মতেই ঠিক থাকে না, ডুব্‌ল ভরা সায়রে ॥ ৩১ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

কেনরে ব্যাকুল মন ঘু'রে ফির নিরবধি ।
দেখরে হৃদয়ধামে রয়েছে পরম নিধি ॥
কারণবারি আঘাতে ছুটিল আলো জগতে,
সে কিরণধারা হ'তে ফুটিল জীবজলধি।
বিন্দু বল পেয়ে নর হইতে চাহে অমর,
ভ্রম কিম্বা আছে তার, আদি অন্ত এক বিধি।
জ্ঞান অনুকূল কার্য্য, হৃদয় ধামে আছে রাজ্য,
কর্ম্মেতে লভিল বাহ্য, হইল মন সমাধি ॥ ৩২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল ঝাঁপ্‌তাল।

আমি তোমার পোষা পাখী ওহে দয়াময়।
তুমি আমার মনমহাজন, সদয় নিদয় ॥
আমি তোমার পোষা পাখী, যা শিখাও তাই শিখি।
যা করাও তাই করি আমি, আমি আমি কিছু নয় ॥
সংসার পিঞ্জরে তুমি, – রেখেছ রয়েছি আমি,
সুখ ভোগে আশ মিটে না ছুটিতে চাহে হৃদয়।

আমারে লইয়ে তুমি, খেলা কর দিবা যামী,
হাসাইলে হাসি আমি, কান্দাইলে কান্দিতে হয়।
চালাইলে চলি আমি, বলাইলে বলি আমি,
তুমি আমি, আমি তুমি, দেহ আত্ম পরিচয় ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল কাওয়ালী

সকলি তোমার কার্য্য সদা যেন ভাবে মন।
তোমা বিনে নাহি রাজ্য বিভূতি ভবন বন ॥
তুমি হ'য়ে কর যাহা, আমি হ'য়ে করি তাহা,
সকলই প্রতিবিম্ব, তুমি মাত্র একজন।
কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম যত, হতেছে আবশ্যক মত,
লীলা খেলা প্রকটিত, সকলি তব সাধন ॥ ৩৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঝাঁপ্

আমার সংসার নয়তো রে ভাই, ওটা একটা পান্থশালা,
দিনেক দুদিন বিশ্রাম ক'রে, অম্‌নি আবার যেতে চলা।
আমার মত কতই জনে, আমার আমার ভেবে মনে,
অহঙ্কৃত ছিল ধনে, পেতে ছিল সাধের মেলা।
তার আগে তার আগে কত, ছিল আর ও শত শত,
চিনি না সে জন্মের মত, ভেঙ্গে গেছে সুখের খেলা।
হাসিটি ফুরা'তে দেয় না, অম্‌নি আবার ছুটে কান্না,
কাজ নাই আমার এ ঘরকন্না, আর ভাল লাগে না জ্বালা।
মনো বল্‌ছে তাই ভাবিয়ে, চোক্ মুদিয়ে দেখ চেয়ে,
গরম ছেড়ে, নরম হয়ে, পর হরিনামের মালা ॥ ৩৫ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল খেম্‌টা।

ফাক্ তালে দুনিয়া ঘুরে সমের ঘরে বেদোম্ ফাঁকি।
ঠিক দিয়া দেখ্ জমাখরচ, ওসুল নাই তোর কেবল বাকী ॥
যখন ভবে পয়দা হ'লে, তখন হ'তে খরচ গেলে,
হিসাব ক'রে দেখ্ না মূলে, হা রে রে পিঞ্জরের পাখী।
পুতুল খেলায় পুতুল সাজি, যাদের লাগি এ কার্‌সাজি,
বম্‌ভোলানাথ দিয়া তারা, রসি বেঁধে মার্‌ছে ঝুকি।
বুঝিয়া না বুঝিস্ কাণা, আখেরে দুনিয়া ফানা,
সার হ'ল তোর ধানবানা, হারে মানুষ কলের ঢেকি।
ভাব বুঝিয়ে মনোমোহন, পলায়ে রাখে জীবন,
ঘুমের ঘুরে দেখে স্বপন, কাল সমনে মার্‌ছে উকি।
পলাইতে পথ আছে, দিন থাকিতে লও না খুঁজে,
পান্থশালার মন্ত্রের কাছে, জান্‌তে পার্‌লে হয় লুকি ॥ ৩৬ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল খয়রা।

দোল্ দোলা দোল্ পুতুল খোকা।
মায়ামঞ্চে দোল খাইয়ে, কি সুখ পেয়ে আছিস্ বোকা ॥
কামনার দুই কাছি দিয়ে, আশাবৃক্ষে দোল টাঙ্গাইয়ে,
দোল্ দিতেছে একটি মেয়ে, দেখ্‌লাম চেয়ে ভঙ্গিবাকা।
মেয়ে নয় সে মায়াপাখী, ফাঁকি দেয় তার ছদ্ম আঁখি,
পুতুল খেলায় মত্ত সখী, দুই ধারে দুই আছে পাখা।
নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে, দোল খেলায় আর হেসে মরে,
ফাঁদ পেতে চাঁদ রাখে ধরে, ভেল্কি ক'রে দেয় ধোকা।
তাঁর দোলেতে সবাই বসে, কেউ বা কাঁদে কেউ বা হাসে,
অম্‌নি মেয়ে সর্ব্বনেশে দশকুশীতে দেয় টুকা।

সে তালে উঠিয়া ফাল, ঠিক থাকে না কালাকাল,
লুটে নেয় সব মালামাল, যার কপালে যা লেখা।
দোল্‌নি খেয়ে মাথা ঘু'রে, মনোমোহন গেছে পড়ে,
বন্ধু জনায় চায় না ফিরে, কান্দ্‌ছে বসে সে একা ॥ ৩৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল আড়া।

বিষয় বাসনা যোগে আছে তব প্রেম মুখ,
গরলে অমৃত রাশি উথলিয়ে দেয় সুখ।
ঘুচাইতে মনভ্রান্তি, সংগ্রামে রয়েছে শান্তি,
বিষামৃত যোগে সদা, বিতরে প্রেম আলোক।
স্বার্থ পরার্থপরতা, সকলই সুখের বার্ত্তা,
অমৃত বরষে পিতা, নেহারি মাতার মুখ।
প্রেম স্বার্থসিদ্ধি ভাবে, তারি কাজে মত্ত সবে,
পরার্থ পণ্ডিত ভাবে, অজ্ঞানী স্বার্থ সংযোগ।
জ্ঞান্ অজ্ঞান্ যোগে, শুধু তাঁহারই শ্রীপদ মধু,
লভিছে জগতবাসী, নহে কেহ পরাঙ্মুখ ॥ ৩৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল আড়া।

চিৎকারে জগৎবাসী, বিকারেতে নাহি সুখ।
কি আশ্চর্য্য লীলা কিন্তু কেহ নহে পরাঙ্মুখ ॥
বিকারে হাহাকারে টানিছে শুধু তাঁহারে,
বহিছে সহস্রধারে প্রেমেরি পূর্ণ আলোক।
অপূর্ণ লীলা চাতুরী খেলিছে রস উদগারি,
অভাবে আছে মাধুরী, ভাবে বিকশিত মুখ।
বিকারে তুচ্ছ করিয়া যাইতে চায় সরিয়া,

কিন্তু রাখে যে ধরিয়া, তাঁহারে ভাবে না লোক।
ইন্দ্রিয় সেবাতে সিদ্ধি, অতীন্দ্রিয় ভাবে বৃদ্ধি,
খাটিবে না কোন বুদ্ধি, ফন্দিতে না সারে রোগ।
আপনি নিজ কৌশলে বন্দি আছে মানব কলে
সাধনসিদ্ধি কর্ম্মচ্ছলে বুঝিয়ে কর সংযোগ ॥ ৩৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল যৎ।

বাহ্যভাবে শয্যা ক'রে মনে কর্‌ছ পারে যেতে।
হরি অন্তর্য্যামী না হইলে, পার্‌তে বোধ হয় কোন মতে ॥
মালা তিলক বেশ ভূষণা, খাট্‌বে না তোর এ নিশানা,
চোর কি সাধু যাবে জানা, পার্‌বি না কাণা ঠকাতে।
কথায় কথায় মুন্সীগিরি, মান্‌ষে কয় মহৎ ভারী,
খাট্‌বে না তোর এ চাতুরী, পারেন হরি সব জানিতে।
আছে টেলিগ্রাফের তার, খবর রাখনিরে তার,
মফঃস্বলের সব সমাচার, নিমিষে যায় সদরেতে।
ঠকাতে পুলিশ বেটা, করেছ কতই ঘটা,
দেখতে পাই কৌপীন আটা, দীর্ঘ ফোঁটা কপালেতে।
ভেবে কয় মনোমোহন, বৃথা এ সব বিড়ম্বন,
ভাবগ্রাহী হলে হরি, ছাড়বে না তায় রবির সুতে। ৪০ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী – তাল ঠেস কাওয়ালী

নিশ্চয় জেনেছি আমি শ্রীপদে না পাব স্থান।
পাদপদ্ম যোগ্য হইলে মন হইত পুষ্প সমান ॥
ধন রত্ন হয়ে তুচ্ছ, শির শোভা ময়ুর পুচ্ছ,

পূজার যোগ্য পুষ্প গুচ্ছ, সুগন্ধ কোমল প্রাণ।
চন্দন তুলসীপত্র, হল তোমার দয়ার পাত্র,
স্বগুণে সতীত্বগুণে, করিলে কৃপা বিধান।
দীণ দাস মূঢ়মতি, না হল পুষ্প প্রকৃতি,
ঘর্ষণেতে ক্রোধ অতি, অসতী অতি অজ্ঞান।
হাস্য পরিহাসে রত, স্বার্থসিদ্ধি সদা ব্রত,
মন হইল না মনের মত, বাহিরেতে ধর্ম্মভাণ।
ভেবে ভেবে মনোমোহন, করিয়াছে এই নিরূপণ ।
হরি অন্তর্যামী না হইলে, কোন মতে পেতেম্ ত্রাণ ॥ ৪১ ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল আড়া।

কাজ কিরে মন গয়া গঙ্গা, যেয়ে কুরুক্ষেত্র কাশী।
প্রাণের ভিতর প্রাণ যদি মোর, প্রেমে বাজায় ভাবের বাঁশী ॥
মহাজন করেছে সীমা, ভাবের গুরু প্রাণ প্রতিমা,
অভেদাত্মা শিব শ্যামা, পরমাত্মা পূর্ণশশী।
ভাণ্ডেতে আছে ব্রহ্মাণ্ড, খণ্ডে খণ্ডে সে অখণ্ড,
দেখে সব কৌশল কাণ্ড, মনে পরে শিশুর হাসি।
ভাব্‌তে গিয়ে মনোমোহন, ভুলে যায় আপ্‌নি আপন,
দেখ্‌বে যদি জনসাধারণ, প্রাণে লাগাও প্রেমের ফাঁসি ॥ ৪২ ॥

রাগিণী প্রসাদী – তাল একতালা।

মন কেনরে ঔষধ খাবি।
যার কৌশলে জগৎ চলে, দেখে কি তাই ভুলে যাবি ॥
বস্তুতত্ত্ব বিচার করে, দেখ্‌না কে বিরাজ করে,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ভাসে কার বিরাট ছবি।

রোগ শোক জন্ম মরণ, সকলি হয় সাধ্য সাধন,
হতেছে তার ইচ্ছা পূরণ, লয় বিকাশে পূর্ণ রবি।
হরে হরে হরি হরি, ঢেলে দিয়ে প্রেমবারি,
সর্ব্বনাম যোগ করি, ভাবিয়ে শ্রীরূপ ছবি।
বিশ্বাসে জ্ঞান অনুপানে, পান কর মনোযোগে,
সর্ব্বব্যাধি বিনাশনে, মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে রবি ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

কথায় বলে ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলি তোমার কার্য্য।
হৃদয়ে না হয় কিন্তু, বিকশিত পূর্ণ রাজ্য ॥
শুধু কর্ম্মেরি কৌশলে, ব্রহ্মাণ্ড আপনি চলে,
পাপরাশি গঙ্গাজলে, ধুইলে না হয় ন্যায্য।
সর্ব্বদা মায়ের ক্রোড়ে, আছে ক্রিয়া লজ্জাভরে,
তীর্থ যাত্রা পুণ্য হবে, অন্তঃশুদ্ধি নহে বাহ্য।
কেনরে ভাবনা এত, বিধাতা কর্ম্ম সঙ্কেত,
কহিছে না হবে প্রেত, হৃদয়ে ক'রো না ধার্য্য।
শত মুখে সুরধনী, অন্তরে দিতেছে ধ্বনি,
পূরাবে ইষ্ট আপনি, সদায় ক'রে থাক সহ্য ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

শুন্ বলি পাগলের চেলা।
পাগল হওয়া নয় সামান্য, দেবের মান্য পাগল ভোলা।
এক পাগল হয় নারদ ঋষি, বীণা বাজায় দিবানিশি,
আর এক পাগল বাজায় বাঁশী, বাসা কর্‌ছে কদমতলা।
আর এক পাগল হয় হনুমান, রামরূপে ধরেছে ধ্যান,

বক্ষ চিড়ে দেখাইল নাম, ছিড়িল মুকুতার মালা।
আর এক পাগল গৌরহরি, ডোর কৌপীন ধারণ করি,
হরি হ'য়ে বল্‌ছে হরি, স্কন্ধে নিয়ে ভিক্ষার ঝুলা।
(যদি) পাগল হওয়া ভাল লাগে, মন্ পাগ্‌লারে ধর্‌গে আগে,
ঐ পাগল তার সঙ্গে থাকে, সব পাগ্‌লামী যাহার খেলা।
মনোমোহন তার স্বভাবেতে, পার্‌ল না সে পাগল হ'তে,
কামিনী কাঞ্চন হাতে, লাগাইল পাগলের তালা ॥ ৪৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

হরণ কর মনের যোগ ওহে দয়াময়।
বিষয়ে আছে ব্যাকুল, শ্রেয়ঃ কার্য্যে হও সদয় ॥
রসাভাব ঘরে ঘরে, কান্তি পুষ্টি নাই সংসারে,
গুপ্ত রাজ্যে প্রেম বিচরে, কে করে তার নির্ণয়।
ভূতে ভূতে নাহি ঐক্য, একে অপরের ভক্ষ্য,
কে শুনে কাহার বাক্য, সখ্য ভাব নাহি রয়।
লীলার সে অসদ্ভাব, হেরিয়ে গেল স্বভাব,
সতত আছে অভাব, পূর্ণ কর এ হৃদয় । ৪৬ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

আমার কথা শুনে না সে, তার কথা শুনিনা আমি।
এক ঘরেতে দুই জনাতে, ঘর কর্ত্তেছি আমি তুমি ॥
সে কেমন জানিনা কিছু, চল্‌তেছি তার পিছু পিছু
কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধে, বিবাদে অপূর্ণ কামী।
ঘুমের ঘোরে পড়ি লুটি, অন্নি আবার জেগে উঠি,

কে জাগায় তারে না দেখি, ছুটাছুটী দিবাযামী।
এমন হইলে থাকা দায়, এক ঘরেতে দু'জনায়,
ক্ষান্ত হ'য়ে শান্ত কর, বন্ধুভাবে আমি তুমি । ৪৭ ॥

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

চল চল চল, বসে থাকা ভাল নয়।
যাই যাই যাই, যেতে হবে তা নিশ্চয় ॥
শুধু আসা যাওয়া, ফিরে ফিরে চাওয়া,
আঁখির ফাঁকিতে মুগ্ধ সমুদয়।
দিতে আঁখির বাকী, সাধ্য নাহি দেখি,
কবির প্রাণ পাখী কত কিছু কয়।
শুধু চখেরি নিশাতে, শুধু মনেরি আশাতে,
ঘুরে ফিরে বারে বারে, এ যাতনা পে'তে হয়। ৪৮ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল ঝাঁপ।

কে তুমি কি কাজ করতে, এসেছ এই মর্ত্ত্যভূমে।
দেখ নাকি বাজে কাজে, দিন কেটে যায় বেহুস্ ঘুমে ॥
ঘুমের ঘোরে দে'খে স্বপন, সদায় তুমি ভুল্‌ছ আপন,
বিপণিতে বাজার করে, হিসাবে তোর মূল ধন কমে।
আগে চিন আপনারে, তারপরে যেও বাজারে,
নৈলে পড়ুবে বিষম ফেরে, বিদেশীর সমাগমে।
রাখিতে সে কুলমান, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান,
দিক্‌বিদিক্ ভাবনা শূন্য, মাতিয়া খেলার ধূমে।
আপনা মঙ্গল খোঁজ, বারেক তলায়ে বোঝ,
নেশার ঝোকে খেলা ছেড়ে, মজরে দয়াল নামে। ৪৯ ॥

রাগিণী কানেড়া – তাল ধামাল।

কি ছার মিছার অহঙ্কার।
স্বভাবে মিশেছে ভাব, কিছুতে না যায় বিকার ॥
বাৎসল্য প্রেমে ভুলায়ে, আমিত্ব দিছে ধরায়ে,
ধরেছে আমায় জড়ায়ে, ছুটিতে না চায় আঁধার
আমিত্ব আরোপ করি, তুমি জীব দেহধারী,
তুমি কর্ত্তা কর্ম্মচারী আমি চিরদিন তোমার।
আমাতে তোমাতে খেলা, রহস্যময় এই লীলা,
বুঝিতে ভোলা বিভোলা, শ্মশান করেছে সার।
অবান্তর নানাভাবে, ভুলায়ে রাখে স্বভাবে,
অভ্যাস না যায় অভাবে, মনোমোহন কি করে আর। ৫০ ॥

রাগিণী সংকীর্ত্তনের সুর – তাল লোফা।

মরি মরি আমি থাক্‌তে আমায় ধরা আর হল না ভেবে মরি।
আমি আমার চিন্তা করে, হারাইলেম্ কাজের গুড়ি।
আমি বা কে আমার বা কে, চিন্‌লাম না তা নেশার ঝোকে,
মায়ার চাকে ঘোর বিপাকে, কলুর বলদ যেন ঘুরি।
ছিলেম বা কই, এলেম বা কই, যাব বা কই, ভাবি তা কই,
যার কেহ নাই হ'য়ে তারই, ভূতের বেগার খেটে মরি।
থাক্‌তে আমি আমার আমার, যায়না ত এই তুচ্ছ বিকার,
ঘটায় কেবল একেতে আর, এদিক সেদিক দুই দিক্ ধরি।
কি করে মনোমোহন, মন হল না মনের মতন,
কর্ম্ম সূত্রে আছে বন্ধন, শক্ত বড় কাট্‌তে নারি। ৫১ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা

আমি আর কিছু জানি না।
জানি কেবল দুঃখ পেলে কর্‌তে সরল প্রার্থনা ॥
নাহি জানি তন্ত্রমন্ত্র,
আসন কিম্বা কোন যন্ত্র,
আমারি ভাব স্বতন্ত্র, অন্ত্রে অন্ত্রে ভাবনা।
পঞ্চাশত বর্ণ তব
শব্দ ব্রহ্ম-স্ব-স্বরূপ,
তাই ভেবে নিজ স্বভাবে, করি তব সাধনা । ৫২ ॥

রাগিণী পিলু - তার ঝাঁপতাল।

দয়াময় রূপে হৃদি, আলো কর নিশি দিবা।
না চাই অন্য রূপ কিছু, না চাই অন্য দেবী দেবা ॥
যা আছে সর্ব্বস্ব দিয়ে, পূজিতে বল দাও হৃদয়ে,
আজীবন ভরি শুধু, করিতে শ্রীপদ সেবা।
যত অকথিত কথা, অগীত সঙ্গীত গাঁথা,
প্রাণের লুকানো ব্যথা, তুমি বিনে জানে কেবা।
কলুষিত পাপভার, তুমি বিনে কেবা আর –
মুছায়ে দিবে আমার, এত দোষ সয়ে বাবা। ৫৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তার যৎ।

থাকি যেন আনন্দ ভিখারী।
আর কিছু ধন যেন কখন, কামনা না করি।
আনন্দে আনন্দ ল'য়ে, থাকি যেন আনন্দ হয়ে,
কেবল আনন্দময়ে, আনন্দে হৃদয়ে ধরি।

জগতে যা কিছু দ্বন্দ্ব, পাইতে শুধু আনন্দ,
ঐশ্বর্য্যেতে ভাল মন্দ, মাধুর্য্যে পূর্ণ মাধূরী।
দয়াময় দয়াময়, দীনে যদি দয়া হয়,
আনন্দ কর উদয়, নিরানন্দ অপসারি।
যে আনন্দে লাগে দ্বন্দ্ব, চাহি না সেই আনন্দ,
নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রাণে ভরি।
পুলকে আপনা হারা, হতে চাই পাগল পারা,
বহায়ে আনন্দধারা, হৃদিসিংহাসনোপরি।
আনন্দে বসিয়া থাক, আনন্দে আনন্দ মাখ,
রূপে প্রাণ ভরে রাখ, সেবক দাস তোমারি। ৫৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

দয়াময় রাজ্য কর হৃদয়েতে।
আমি তুমি এক হইয়ে, থাকি সদা হরষেতে।
একটুকু নও হৃদয় ছাড়া, তবু তোমার পাই না সাড়া,
হৃদয়যোগে জগত জোড়া, আছ নিজ ভাবেতে।
প্রকাশ যুগল আঁখি, কেবল তোমারে দেখি,
হয়ে গিয়ে মাখামাখি, মজে থাকি তোমাতে। ৫৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ– তাল একতালা।

কবে তুমি আমার হবে –
আমি অধীর হলেম, নিশি দিন সেই ভাবনা ভেবে।
কবে পেয়ে নিজ ভাবে, মিশিব তব স্বভাবে,
তোমার আমার দেখা হতে, যত বাধা দূরে যাবে।
আমার আমি তব সনে, মিশ্‌ব কবে প্রাণে প্রাণে,
আমি তুমি আমি হয়ে, খেল্‌ব খেলা এই ভবে। ৫৬ ॥

রাগিণী বাউল – তাল একতালা।

নামের এম্‌নি নিশা, হারায় দিশা, বিষামৃত এক করে।
মদ্ না খেয়ে, মাতাল হয়ে, নাচে সবায় প্রেমভরে।
(নামে) জ্ঞান থাকে না ছোট বড়, আমি তুমি আপ্‌না পর,
গুরু শিষ্য রাজা প্রজা, এক তরঙ্গে ভেসে যায় রে।
(নামে) নাই কোন বিচার, হরি মামুদ একাকার,
নামে আপ্‌নি এ'সে প্রেম উথলে, সবার প্রাণে একবারে।
(নামে) ফুটে আঁখি ছুটে ধারা, লুটে মধু সাধু যারা,
মত্ত হয়ে মন ভ্রমরা, হরি গুন্ গুন্ গান করে। ৫৭ ॥

রাগিণী আশোয়ারী – তাল আড়াঠেকা।

সান্ধ্য সমীরে, মধুর স্বরে গাইছে তাঁরে,
মিহির তারা সকলে, পশুপাখী নরে।
কেন ওরে মূঢ় মন, হেলায়ে এ হেনক্ষণ,
করিছ বৃথা কর্ত্তন, কীর্ত্তন কর তাঁরে।
প্রকৃতির প্রতিস্তরে, একতানে সমস্বরে,
তাঁহারি মহিমা স্ফুরে, কিবা ভবন কান্তারে।
হেরিয়ে স্বভাব শোভা, হওরে মানস লোভা,
করিতে তাঁহার সেবা, অকপট অন্তরে। ৫৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

মনে আশা যদি পাবে তাঁরে –
বিশ্বপ্রেম হৃদয়ে ধরে, কারণ বারিতে ভেসে যারে।
কালী কৃষ্ণ শিবযোগে, ভালবাসা অনুরাগে,

নিতি নব উপভোগে বিলাসে রাখ আদরে।
সুযোগে সুবোধজন, হয়ে অতি বিচক্ষণ,
সহজে কর সাধন, সে ধনে সদা অন্তরে।
ধরিয়ে বহুত্ববাদ, একত্বে পূরাও সাধ,
যোগপূর্ণ হৃদি মাঝে, অভেদী প্রেম বিস্তারে। ৫৯ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল কাওয়ালী।

দেখব বলে আশা করে, বসে আছি অনিবার।
কি হবে কি হবে গতি, দেখা না পেলে তোমার।
চাতক পাখীর মত, আছে প্রাণ আকুলিত,
উদিয়ে হৃদয় মাঝে, বরিষ হে জলধার।
যে যাহার প্রিয় আছে, যায় সে তাহার কাছে,
সে যদি না ফিরে চায়, তবে কি প্রাণ বাঁচে তার। ৬০ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল লোফা।

তার সনে মন হওরে মাখা, যে জন তোরে ভালবাসে।
আপন হতে আপন যিনি, স্নেহ করে নির্ব্বিশেষে।
মনে প্রাণে দেখা দেখি, চিদানন্দে থেকে সুখী,
প্রেমময়ে প্রেম কর, মনেরই অভিলাষে।
পঞ্চপ্রেমে পঞ্চভাবে, সাধরে মন মাধবে,
প্রীতিকলা পূর্ণ হয়ে, পূর্ণচন্দ্র হৃদয়াকশে।
যাজ্ঞা কর শিশু হয়ে, সহজ প্রেম আসিয়ে,
গুরু শিষ্য স্বামী স্ত্রীতে, পূর্ণ হবে অবশেষে। ৬১ ॥

রাগিণী কাফি – তাল একতালা।

হরিনামে মন মজায়ে, দয়াময়ের পূর্ণছবি –
দেখরে হৃদয় মাঝে, স্বভাব সমুদ্রে নাবি।
অলকা তিলকা কিবা, কি ছার বিদ্যুৎ প্রভা,
ও চরণ তলে পড়ে, কত কোটি শশী রবি।
নয়নের অভিরাম, নহেরে বিন্দু বিরাম,
যে দেখেছে সে ভুলেছে , একেবারে গেছে ডুবি। ৬২ ॥

রাগিণী পিলু – তাল একতালা খয়রা।

না দিলে প্রেম সোহাগা, কেলে সোনা গল্‌বে কিসে।
বলেছে জহুরী যারা, আর কিছুতে গলে না সে।
ব্যভিচার ক'রে ত্যাগ, জ্বাল অগ্নি অনুরাগ,
নিষ্কাম ভকতি বলে, বিরহ দীর্‌ঘ শ্বাসে।
সে আগুণে দিয়ে হোম, দাওরে কণিকা প্রেম,
দেখ্‌বে সে যে আপ্‌না হতে, তরল হ'য়ে আসে।
ভেব না কঠিন বলে, ভেড়ার শৃঙ্গে হীরা গলে,
তত্ত্বজ্ঞান শিখিয়ে দেখ, আলোকে আঁধার নাশে। ৬৩ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী – তাল আড়াঠেকা।

আলোকের পূর্ণ ছবি, আর কত কাল রবে দূরে।
আমি যে রয়েছি পড়ে, যে তিমিরে সে তিমিরে।
কি কৌশল করেছ বিধি, মাঝখানেতে ভবনদী,
ওপার তুমি এপার আমি, নয়ন ঢাকা শিশিরে।
হাসে রবি হৃদাকাশে, উজলিয়া দশদিশে,
অন্তরে বাহিরে হেরি, কেবলি নাথ তোমারে। ৬৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

মন মজরে ভজন মাধুরীতে।
নিয়ত রমণ কর, হরিপদ যোনিতে।
কালী কৃষ্ণ শিবযোগ, প্রস্ফূটিত যোনিমুখ,
ব্রহ্মানন্দ রস তাহে, পাবে মৈথুনেতে।
জ্ঞান প্রেম কুচগিরী, দৃঢ় আলিঙ্গন করি,
পিয়রে অধর সুধা, সাধুজন মুখেতে। ৬৫ ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল তেউড়া।

কি হেরি বিকট দৃশ্য, কোলাহলে পূর্ণ বিশ্বমেদিনী।
নীরব কোথা আছে যে, সেথা যেয়ে জুড়াব পরাণখানি।
এ বিশ্ব বিপুল তটে, মানব মানবী জুটে,
ঘোর নাদে নাদে সদা, সুখ দুঃখ কাহিনী।
নিদ্রিত প্রকৃতি কোলে, জগত জীব সকলে,
স্বপনে ভুলায়ে রাখে, মায়া মনমোহিনী।
এ কি চমৎকার ভাব, ভুলিয়ে নিজ স্বভাব,
অভাবেতে ভাব ভাবিয়ে, ডুব্‌ছে জীবনতরণী। ৬৬ ॥

রাগিণী আলেয়া – তার ঠুংরি।

জীবনে তোমায়, কভু যেন ভুলিনে।
ভুলের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে, রাখ সদা সদনে।
সংসারে বিভোর মন, ভুলে আঁখি অনুক্ষণ,
হেরিতে সেরূপ তব, সচ্চিদ্ আনন্দ ঘনে।
অসার সার ভাবিয়ে, আছি মাতোয়ারা হয়ে,

কি উপায় হবে ভবে, দীনহীন অজ্ঞানে।
ভাঙ্গিয়ে ভুলের ভুল, দাও হে পাতিয়ে কোল,
বিভোর হয়ে থাকি সদা, তোমারি নাম গ্রহণে। ৬৭ ॥

রাগিণী সিন্ধুর ভৈরবী – তাল মধ্যমান।

শুন্‌রে মানুষ এক অপরূপ ধ্বনি।
অনাহত বীণা বাজে, দিবস যামিনী।
কে বাজায় কোথা বসে, চল মন তার উদ্দেশে,
গেলে পরে সেই দেশে, মিশিবে হৃদয়খানি । ৬৮ ॥

রাগিণী সোহিনী – তাল পোস্তা।

কামে প্রেম করিল বিনাশ।
স্বকর্ম্মে বিপাকে টানে, না হতে প্রকাশ।
বহে প্রেম সোমধারা, পুলকে আপনাহারা,
ঊর্দ্ধগতি মূলাধার, তদূর্দ্ধে নির্ম্মলাকাশ।
আকাশে প্রকাশে ইন্দু, ঝরে সুধা বিন্দু বিন্দু,
কামিনী কটাক্ষে সিন্ধু, উথলিয়ে হয় হ্রাস।
আকর্ষণে বিকর্ষণে, স্খলিত মাধ্যাকর্ষণে,
কালের ঘরে ফেলে টেনে, দুর্ব্বল চিদাভাস।
ধরিতে সরল রেখা, অম্‌নি হয়ে যায় বাকা,
হল না সাধন রাখা, লাগিল অতি তরাস।
মণিতে জনমে মন, সে ধন বিনে সাধন,
হবে না যেন কখন, মনোমোহন নিরাশ। ৬৯ ॥

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

ধর্ ধর্ ধর্ তোর পোষাপাখী, যেতে দিস্ না তারে উড়ি।
ভক্তি ফাঁদে ফাঁদ পাতিয়ে, আঁখিতে লাগায়ে ডুরী।
চায় যদি সে ফাকি দিতে, ভুলিস্ না তুই তার ফাঁকিতে,
সে যা বলে করিস্ না তাই, তবেই ভাই রবে পড়ি।
ছট্ফটাবে যতই সে, থাকিস্ না তুই তাহার পাশে,
আড়াল থেকে দেখ্‌বি কেবল, পাগল নাচে কেমন করি।
সায় দিবি না তার কৌশলে, চল্‌বি কেবল উল্টা কলে,
মনোমোহন কয় তাহা হইলে, অবহেলে যাবি সারি। ৭০ ॥

রাগিণী পিলু – তাল ঝাঁপতাল।

জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, ডাকি তোরে মহাপ্রাণ।
প্রাণের ব্যথা প্রাণে থাকি, শুন না কি তুমি প্রাণ।
শুনিয়ে প্রাণেরি গান, আয়রে ধরা দেরে প্রাণ,
প্রাণে প্রাণে কোলাকোলি, করে জুড়াই আমার প্রাণ।
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, বুঝে কি সে আর প্রাণে বিনে,
তাই সে আমি প্রাণের সনে, মিশাতে চাই আমার প্রাণ। ৭১ ॥

রাগিণী বাউল – তাল খেম্‌টা।

হাওয়াতে উড়্‌ছে ঘুড়ি, জোত্ দড়ি তোর তাঁর হাতে।
দিবানিশি এদিক্ সেদিক্, ঘুরছ্ কেবল শূণ্য পথে।
হাওয়ার জোড়ে উপরে ধেয়ে, স্বভাব দোষে কান্না খেয়ে,
ঠিক্ হইছ আবার যেয়ে, হাতের দড়ি টান দিতে।
কখন কখন পাক্ বাতাসে, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নামায় এসে,

পড়ুতে যেয়ে উড়ুতে হইছে, সাধ্য কি তোর সূত ছিঁড়ুতে।
কুবাতাসে গোপ্তা খেয়ে, পড়ুলে আবার দেয় উড়ায়ে,
কিছু উঠ্‌লে হাওয়া যেয়ে, জোর দিয়ে ঠিক করে তাতে।
আপ্‌না হাতে রেখে নাটাই, খেইল খেল্‌তেছে আলেক্‌সাই
অহঙ্কারের নাই বড়াই, যা হতেছে তাঁর ইচ্ছাতে।
গ্রামের ভিতর নীচের হাওয়া, সমান নাই চাই মাঠে যাওয়া,
উড়ুলে ঘুড়ি উপড়ে সমান, বস্‌লে যেয়ে সমান জোতে।
মনোমোহনের পতং ঘুড়ি, অল্প সূতায় ঘুরাফিরি,
কি করি যা করায় করি, দিন গেল ভাই ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে। ৭২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল আড়খেম্‌টা

সাধু হওয়া সামান্যতো নয়।
আগে সত্য পাছে দয়া, নামে রুচি হলে হয়।
ভাবে চাই মরম গড়া, সাম্য সরলতা ভরা,
আত্মজ্ঞান জগত জোড়া, তুচ্ছ করি লজ্জা ভয়।
পরিহরি কুলমান, দিয়ে স্বার্থ বলিদান,
পর উপকারে প্রাণ, উৎসর্গ করিতে হয়।
স্বার্থ শূন্য সরলতা, ভেদাভেদ নাহি যথা,
মনোমোহন কহে তথা, সাধুতার পরিচয়। ৭৩ ॥

রাগিণী পিলু – তাল ঝাঁপ্‌তাল।

গুরু কল্পতরু মূলে –
আশ্রয় নিয়ে বসে থাক, ওমন আমার কুতূহলে।
গুরু নিত্য গুরু সত্য, গুরু হয় পরম তত্ত্ব,
শ্রীপদে মজোয়ে চিত্ত, ভাব নিত্য প্রাণ খুলে।
মায়াতে মানুষদেহ, ক'রো না কোন সন্দেহ,

গুরুকৃপা বিনে কেহ, পায় না মুক্তি কোন কালে।
জীবনের মধ্য বিন্দু, হৃদাকাশে গুরু ইন্দু,
পার হইতে ভবসিন্ধু, বন্ধু নাই আর ভূমণ্ডলে।
যা দেখ ব্রহ্মাণ্ডময়, গুরু ভিন্ন আর কেহ নয়,
হলে গুরু পরিচয়, আঁধারে আলোক জ্বলে।
মনোমোহন আত্মহারা, অহঙ্কারে মাতোয়ারা,
গুরুপদ সেবা করা, হল না তারি কপালে। ৭৪ ৷৷

রাগিণী 'সবেমিলে একই প্রাণে সুর – তাল লোফা।

অনেক দিন হয় গেছে ভেসে, বিচ্ছেদসাগরে তরী।
আরত সে এল না ফিরে, দিবানিশি কেন্দে মরি।
আমারে বসায়ে রাখি, খবর আন্‌তে গেছে পাখী,
এখনও এল না দেখি, হয়ে গেছে কত দেরী।
বসন্তের আগমনে, বসিয়ে ফুলবাগানে,
প্রভাতি মলয়ার কাণে, চুপে চুপে ধীরি ধীরি –
ক'য়ে দিছি সবিনয়ে, বলে গেছে থাক্‌তে ব'য়ে,
আছি পথ পানে চেয়ে, আরত সে এল না ফিরি।
বিরহে বিদগ্ধ প্রাণ, জুড়াইতে নাহি স্থান,
তারি গুণ করে গান, কেবল সান্ত্বনা করি। ৭৫ ৷৷

রাগিণী সিন্ধু কাফি – তাল একতালা।

তারা চল্‌ছে বেয়ে দেখ্‌তে পেয়ে, ধেয়ে যেয়ে নায়ে চড়েছি।
আমার ভাঙ্গা নায়ে বাদাম দিয়ে, তর্ তর্ তরী ছেড়েছি।
ভাটী তরী ঢেউ খেলে উজান, ফাড়াচিড়া তেনা জোড়া নায়ের
বাদাম্‌খান,

পারের কিনার ঘেসে চল্‌ছি ভেসে, বসে কসে হাল ধরেছি।
গাঙ্গে ভাঙ্গে যে কূল সর্ব্বদায়, ফাটা মাটী পড়ছে ছুটী সে কুল
আমি নায়,
খেয়ে ঢেউয়ের বারী, কাঁপছে তরী, ডরে হরে হরে ডাক্‌তেছি।
ফাটা মাটী কূল ঝাপটের ঘায়, লয়ে তরী ডুবে মরি কখন
জানি হায়,
আবার মেঘে ডাকে ঘোর বিপাকে, কে আমাকে রাখে
ভাব্‌তেছি।
নায়ের নাই ছৈয়া কি নঙ্গর, অকূলেতে পড়ছি ভেসে কোথায়
করি ভর,
ছুট্‌ছে তুফান ভারী সামাল তরী, থর্ থর্ করি কাঁপিতেছি।
বড় নায়ের মাঝি যে সকল, সাহস দেখে উঠ্‌ছে রেগে ভাব্‌ছে
সে পাগল,
নৈলে এমন ক'রে পারি ধরে, মরণ ভয় নাই দেখ্‌তেছি।
অকূলের কূলকাণ্ডারী যে জনা, তার পায়ে সঁপেছি মন ভরসা
করুণা,
ধরে অকূলে কূল, হয়ে ব্যাকুল, কূলকাণ্ডারীর লাগ পেয়েছি।
এমন নৈলে কেউ তাঁরে পায় না, অকূলে কূল ধর্‌তে একা
বুঝেছি করুণা,
সে যে কাঙ্গালের বল, প্রাণের সম্বল, ভক্তবৎসল নাম চিনেছি।
ভব তরীতে ভয় আর করি না, কাণ্ডারী বড়ই সুজন গিয়াছে
জানা,
দিয়ে হাল্‌টী হাতে হাইল মাচাতে, বসায়ে তায় বসে আছি। ৭৬ ৷৷

রাগিণী ইমন ভূপালী – তাল কাওয়ালী।

ভুল বলে তুই হারাস্ নেরে মূল।
যে জন আছে বিশ্ব জুড়ে, নাই বল্‌বি কেমন করে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে, ডুব্ দিয়ে তুই রত্ন তোল।
সাড়ে তিন পেছ বেড়ার মাঝে, পৈত্রিক ধনের গোলা আছে,
সাপিনী তার চৌকি দিছে, যে ধরেছে পাইছে মূল।
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে, গেলে ভক্তিবলে,
বোটা ছাড়া ফুটা আছে, দেখতে পাবি দুটী ফুল।
হরির নামে লম্ফ দিয়ে, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে,
এম্‌নি ধন কি যাবে লয়ে, করে মিছা গণ্ডগোল।
না হইলে আত্মবোধ, হয় কি জীবত্ব রোধ,
ভুল্ বুঝে কি জগৎ আছে, বেদ বেদান্ত সবাই ভুল ?
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, সেই প্রেমেতে অচৈতন্য,
ভেবে শূন্য হলি শূন্য, শূন্য পায় সে হইলে ভুল।
পুরুষ নির্গুণ ব্রহ্ম, লীলাতে স্বগুণ কর্ম্ম,
বুঝে দেখ্ না সূক্ষ্ম মর্ম্ম, অবতীর্ণ সূক্ষ্ম স্থুল।
এ মায়া প্রপঞ্চে ভুলে, আত্মতত্ত্ব আছ ভুলে,
ভুল তোমারি ভুলের মূলে, কভু নয় সে নাম্‌টী ভুল।
নামে চলে বাতাস, হয়রে প্রকাশ,
যে পেয়েছে নামের মর্ম্ম, ছেড়ে দিছে মায়ের কোল।
ভেবে বলে মনোমোহন, সত্য আছে মহাজন,
করে দেখ্‌রে ওজন, মাধ্যাকর্ষণ মূল।
তুই মনে ভেবে দিগ্ হারাইলিরে দিক্,
আসলেতে ঠিক্ থাকিলে, অকূলেতে পাইতি কুল। ৭৭ ॥

রাগিণী মালকোষ – তাল ঝাঁপ্‌তাল।

ভক্তের ভাঙ্গা তরী, তোমায় লয়ে ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে।
চায় না কিছু আপন স্বার্থ, সকল বিত্ত অর্থ তুচ্ছ করে।
তোমার নামের কাঙ্গাল হয়ে, এই জীর্ণ দেহতরী লয়ে,
ভাবের বাদাম উঠাইয়ে, নাম বিলায় সে ঘরে ঘরে।
প্রেমের ঝুলি নামের বুলি, কপালে কলঙ্কের ডালি,
কেউ দিচ্ছে তায় গালাগালি, কেউবা কিছু আদর করে।
পাখী যেমন পাখা দিয়া, শিশুছা রাখে ঢাকিয়া,
তেম্‌নি তোমার হৃদয় দিয়া, জাগ ভক্তের হৃদ্‌মাঝারে।
তুচ্ছ সম্পদ পেল যারা, দীন দেখে মুখ ফিরায় তারা,
নির্ধনের ধন তোমার চরণ, কাঙ্গাল বৈ কে কিন্‌তে পারে।
যাদের নাকি কিছু আছে, পায় না যেতে তোমার কাছে,
সব দিয়ে সব নাই হয়েছে, – সব দিছে যার তোমার তরে।
মনোমোহন কয় ভেবে মনে, কাঙ্গাল নয় সে অতুল ধনে,
ধনী হয় ধন বিতরণে, রং সেজে’ছে রঙ্গের ঘরে।
তার ভাঙ্গা নায়ে চিরকাল, আপনি হরি ধরেন হাল,
ছিন্ন করি মায়াজাল, সকালে যায় ভব পারে। ৭৮ ॥

রাগিণী বারোয়া – তাল আড়াঠেকা।

সাধু সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে, প্রেমতীর্থে মুড়ায়ে মাথা,
গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধর, ওগো আমার ভক্তিলতা।
বিশ্বাসের আক্‌ড়া দিয়ে, পাক্‌ড়াইয়ে ধর তারে,
কুবাতাসের ঝাক্‌ড়া পড়ে, ভাঙ্গে না যে লতার মাথা।
চৌদিকে দাও সত্য বেড়া, ফির্‌বে তাতে ছাগল মেড়া,
জল ঢাল তায় ঘড়া ঘড়া, ফুটিয়ে ফুল মেল্‌বে পাতা।

ফুলের গন্ধে মনঅলি, – মত্ত হলে শুন্‌রে মালী,
নয়ন ভ'রে তুমি খালি, সেই ফুলে দেখিও রাধা।
রাধা পদ্ম ফুট্‌লে পর, বাজা'য়ে বাঁশী গুন্ গুন্ স্বরে,
কালা ভ্রমর আস্‌বেই উড়ে, কালো নয় সে উজ্জ্বল সাদা।
মনোমোহন কয় নীচের মাটি, হয় না আমার পরিপাটি,
মিছামিছি কান্দাকাটি, শুক্‌না মাটি হয় কি কাঁদা । ৭৯ ॥

রাগিণী মূল্‌তান – তাল আড়াঠেকা।

তুমি না জানাইলে তোমারে কে জানে।
ষড়্ দরশনে না পায় দরশন, অন্ত নাহি পায় বেদ পুরাণে।
অবধি হইতে পর্য্যন্ত পর্যন্ত, তব মহিমার নাহি আছে অন্ত,
অনাদি অনন্ত সর্ব্ব পরিব্যাপ্ত, জুড়িয়ে রয়েছ ক্ষিতি বিমানে।
বহুরূপী ভাবে স্বভাব তোমার, ভাবিয়ে কে পারে অকূলে কিনার,
তুমি হবে যার হৃদয়ে তাহার, জানাইয়ে দেও আপনি আপনে।
কঠোর তপস্যা বেদ অধ্যয়ন, শ্বাস অবরোধ কিম্বা অনশন,
যাগ যজ্ঞ যোগ নিবৃত্তি শাসন, দ্বৈত জ্ঞান করি ভাবে সাধারণে।
অদ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্ট অদ্বৈত, তোমারে কে জানে করে মত দ্বৈত,
যা আছে জগতে বৈধ কি অবৈধ, কর্ত্তা কর্ম্ম তুমি তোমারি বিধানে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ঘুরে অনিবার, ষড় ঋতু সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে তার,
বিমান ক্ষিতি যোগে হয়ে একাকার, এক বিনে দুই নাই ভুবনে।
অখণ্ড অসীম পরম অব্যয়, খণ্ড জ্ঞানে লণ্ডভণ্ড সমুদয়,
একেরই কাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্ম অণ্ড, প্রকাণ্ডেতে খণ্ড ভাবে ক্ষুদ্র জ্ঞানে।
ভাবিতে ভাবিতে হলে ব্রহ্মভাব, খণ্ড জীবে ফুটে প্রকাণ্ড স্বভাব,
স্থূল সূক্ষ্মময়, ব্রহ্ম দয়াময়, কৃপাহি কেবল সত্য এ ভুবনে।
কারণের গতি কর্ম্মেতে বিকাশ, কর্ম্মই কারণ নিত্য চিদাভাস,
সৎ সত্য সৎ স্বতঃস্বপ্রকাশ, বিকাশ নাহি আর মনো ভাবে মনে। ৮০ ॥

স্বরূপ নির্ণয়

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

হরি তোমায় জান্‌তে গিয়ে, পড়েছি এক বিষম গোলে।
আসল কথার ঠিক পাইনা তার, শুনি কেবল যে যা বলে।
পুরাণে কয় এরূপ সেরূপ, কে জানে তার কিবা কোনরূপ,
বেদান্তে কয় অরূপ স্বরূপ, ঘটে পটে সর্ব্বস্থলে।
বাইবেলে কয় ঈশার পিতা, আর যত হয় সবই মিথ্যা,
ঠিক্ পাইনা তার কোন কথা, কোন্ কথা রয়েছে মূলে।
কোরাণে কয় ঠিক দুরস্ত, বটে মুহম্মদের দোস্ত,
হয়ে গেলাম হেস্তনেস্ত, পড়ে মস্ত কথার ভুলে।
গৌরাঙ্গে কয় কৃষ্ণরাধা, বৌদ্ধে বলে বুদ্ধের কথা,
নাস্তিকে কয় ঈশ্বর মিথ্যা, আপ্‌না আপ্‌নি জগৎ চলে।
ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, ইঞ্জিল, তৌরিত, ফুর্‌কান, জব্বর,
যার যার ভাবে সেই জব্বর, ধান্দা দিছে কথার ছলে।
সাংখ্যে কয় ঈশ্বরাসিদ্ধে, ভাবুকে কয় হৃদয় মধ্যে,
হয় না কিন্তু কার সাধ্যে, ধর্‌তে তাঁরে কোন কালে।
জ্ঞানী বলে জ্ঞান হয় বড়, ভক্তে বলে ভক্তি ধর,
যোগী বলে কুম্ভক কর, চে'পে ধর দোমের কলে।
কেহ কয় জপ ওঁকার, কেহ কয় হংস আকার,
ঠিক পাইনা তার কোন কথার, কেহ কয় সহজে মিলে।
কেহ কয় ভজন সম্বল, কেহ কয় কৃপাহি কেবল,
তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে সকল, ফল নাই কিছু কর্ম্ম ফলে।
যে যা বলে সবারি মূল, এক ব্রহ্ম সূক্ষ্ম স্থূল,
লীলাতে ঘটাইছে গোল, দীনহীন মনোমোহন বলে।
কৃপা হলে পাবে কৃপা, স্ববশ হবে অজপা,
তুচ্ছ হ'য়ে সোণা রূপা, রূপে যাবে নয়ন ভুলে। ৮১ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঝাঁপতাল।

নমোঃ হরি শিব গঙ্গা, কালী কৃষ্ণ কেশব।
সকল মিলিত, মহান্ রূপ, ঈশ্বর, বিশ্ব সম্ভব।
অধঃ ঊৰ্দ্ধ দিশ দশ, ব্যাপিত মহদ্ যশ,
এক এব পরংব্রহ্ম, বিভূতি দেব মানব।
যত সব রূপ নাম সকলই সিদ্ধকাম,
অবিরাম অনাহত, নাদিত মহাপ্রণব।
অনুরাগ উপাসনা, করিবে পূর্ণ বাসনা,
বিশ্বে কর মহাপ্রেম, যাহাতে নাহি কৈতব। ৮২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ– তাল আড়াঠেকা।

কালী নাম কৃষ্ণকান্তি, শিবযোগ দয়াময়।
সাধ্যযোগ সাধনাতে, আনিলেন এ সময়।
কালীনামে কর্ম্ম যোগ, করিল সিদ্ধি প্রয়োগ,
কৃষ্ণনামে প্রেমমুখ, ধরে শিব প্রেমময়।
গুরুমূর্ত্তি সহস্রারে, স্বাধিষ্ঠান মূলাধারে,
ষড়চক্র ভেদ করে, একাকার জ্যোতির্ম্ময়।
যোগেতে বিমান ক্ষিতি, শুদ্ধযোগে এল প্রীতি,
দেখরে দেখ সম্প্রতি, বিভূতি এক দয়াময়। ৮৩ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল লোফা।

সে যে স্বতঃস্ব প্রকাশ –
জ্যোতির্ম্ময় রবি ছবি, নিত্যানন্দ চিদাভাস।
নির্ব্বিকল্প নিরাকার, অখণ্ড মণ্ডলাকার,
জুড়িয়ে অনন্ত বিশ্ব, পৃথিবী আকাশ।

বিধি বিষ্ণু আদি যত, তাঁহারি শক্তি সম্ভূত,
ক্ষুদ্র কণিকার মত, খদ্যোত বিকাশ।
কত সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয়ে গেছে হবে হয়,
নাহি তার বিপর্য্যয়, বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস।
রবি চন্দ্র গ্রহগণ, পাইয়ে তাঁর কিরণ,
করে আলো বিতরণ, কিবা বার মাস।
ত্রিগুণাতীত কারণ, প্রণবরূপ ধারণ,
কররে জীবন সাধন, পাইবে উল্লাস। ৮৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল আড়াঠেকা

প্রভুহে প্রণবপতি অনাদি কারণ।
পরম গুরু স্বরূপ, অপরূপ দর্শন।
হেরি অনন্ত আকাশে, তোমারি করুণা হাসে,
রবি শশী গ্রহ তারা, বিতরে কিরণ।
মেঘ জল বরিষয়ে, পবন সঞ্চারে ভয়ে,
তোমারি মহিমাপূর্ণ, অনন্ত ভুবন।
কত অকথিত কথা, অগীত সঙ্গীত গাঁথা,
অনাহত ধাইছে, স্পর্শিতে চরণ। ৮৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ – তাল ঠুংরী।

তুমি আলোকে পূর্ণ রবি,
বিশ্ব আঁধারে ছায়াছবি।
ছদ্মবেশী প্রতিবিম্ব, জগতে জীব সবি।
সে কারণ কিরণেতে, জীবন্ত জীব জগতে,

অভেদ খেলিছে নিত্য, বর্ত্তমান ভূত ভাবী।
কিছু নয় এ বিভূতি, বিচিত্র বিদ্যুৎ দ্যুতি,
দেখিল বিভোর প্রাণে, হরষে নিরস কবি। ৮৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ – তাল পোস্তা।

হরিনাম কৃষ্ণযোগে, রামরাজ্যে পাইল জীবন।
(এবে) রামকৃষ্ণ পরিহরি, হরি হরি বল মন।
হরি সদয় নিদয় – যোগে হ'ল দয়াময়,
পরিহরি হরি হরি, দয়াময় বল এখন। ৮৭ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

অপরূপ রূপ অতি, হেরিয়ে সে বরণ।
উল্লাসে আপনি আসে, ডাকি ব্রহ্ম সনাতন।
জগতের আশে পাশে, তোমারি ছবি প্রকাশে,
যেন কোটি শশী এক হইয়ে, বরষে কিরণ।
যখন যেদিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই,
বিশ্বময় দয়াময়, তোমারি প্রেমানন। ৮৮ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল ঝাঁপ্‌তাল।

তোমারি সৃজিত বিশ্ব, তোমাতেই হবে লয়।
স্থূলরূপে পল্লবিত, ইথে কি আছে সংশয়।
প্রস্ফুটিত এ সংসার,আদি অন্ত অন্ধকার,
অব্যক্ত বিচিত্র খেলা, বিভূতি হে বিশ্বময়।

কে বুঝে নিগূঢ় মর্ম্ম, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম,
বিশ্বব্যাপী সত্ত্বা তব, এক শক্তি জ্যোতির্ম্ময়।
তোমাতেই আমি আছি, আমি তুমি মিছামিছি,
আমি যে তোমারি নাথ, তুমি নাথ আমিময়। ৮৯ ॥

রাগিণী ভজন – তাল তেউট।

অহং প্রতিমা ওঁ তৎ সৎ, ব্রহ্মরূপ জয় দয়াময়।
পূর্ণ কলেবর পরম ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিধর সোহং পরিচয়।
মৃত সঞ্জীবন অপূর্ব্ব মিলন, শুভ্র জ্যোতিঃ ঘন কালী কৃষ্ণময়।
বিশ্বে অবতার যবনিকা পার, পঞ্চ প্রেমাধার হরি প্রেমময়।
অকলঙ্ক শশী সত্য তত্ত্ব মসী, তোমাকে পরশি কৃতার্থ হৃদয়।
সুন্দর মানব অতুল বিভব, শিব অভিনব বিলাস বিলয়।
প্রেমের মূরতি প্রেমময়ী সতী, যুগল জায়াপতি সদয় নিদয়। ৯০ ॥

রাগিণী বাহার – তাল আড়া।

চিন্ময় মানুষ ছবি, ভাবরে মন মানুষ।
বিলাসে রসাল ভাবে, স্বভাবে না আছে দোষ।
ব্রহ্মাণ্ডেতে যত ভাব, মানুষে তত স্বভাব,
কর্ম্ম যোগে আছে বাহ্য, প্রেমেতে পূর্ণ সন্তোষ।
তুমি আমি যত জীব, সবে ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব,
লীলাচ্ছলে কেলি করে, সঙ্গযোগে স্ত্রী পুরুষ। ৯১ ॥

রাগিণী মনোহরসই – তাল খেম্‌টা।

অরূপ পানে আর যাইও না মন –
স্বরূপ পানে আকুল মনে, চেয়ে থাক অনুক্ষণ।
ধর্‌তে গেলে না দেয় যে ধরা, তাঁরে ধর্‌তে যেও না মন সেত অধরা,
ধরায় যে জন ধরা দিয়েছে, ধর যেয়ে তাঁর চরণ।
প্রাণে প্রাণে পৃথিবী জোড়া, পরখ করে –
দেখ্‌না আপন তুই কি প্রাণহারা,
দেখ্‌বি যদি প্রাণের মানুষ, স্বরূপে কর দরশন।
অরূপের রূপ্ স্বরূপে গড়া চেয়ে দেখ্ না –
রূপেই ভাসে রূপের চেহারা,
কোন্ রূপে তুই ভুলে র'লি, চোখ থু'য়ে অন্ধ নয়ন।
ধরায় যেরূপ দিয়াছে ধরা, তাঁরে ধর্‌তে –
ডুবা'য়ে দেও নয়ন-তারা,
ধরায় ধরে যাও না সেরে, অধরার কি প্রয়োজন।
বলিরে মন খেলাতে বেহুস, ধর্‌তে গিয়ে –
ঠকিস্ না তুই অধরা পুরুষ,
রাইরূপে তাঁর অঙ্গ ঢাকা, অরূপ স্বরূপ একই জন।
লাগাইয়ে প্রেমের ডুরী, ধরায় ধরে শুন কেবল মোহন বাঁশরী,
কিশোরী পাসরি হরি, থাক্‌তে নারে একই ক্ষণ।
শ্রীহরি কিশোরীর খেলা, খেলারে মন –
করে যতন হয়ে বিভোলা,
তাতেই আছে নিত্যলীলা, লীলাতীত নিরঞ্জন।
যোগে যাগে পাবি না মন তাঁরে, অনুরাগে কেনা –
শুধু ব্যক্ত সংসারে,
ভক্তিভরে ডাক্‌লে পরে, মনেই পাবি মনোমোহন। ৯২ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

তোমার ভুল ভাঙ্গা রূপ ব্রহ্মময়।
আর যত সব ভুলের মূর্ত্তি, কীর্ত্তি ছাড়া কিছু নয়।
এরূপ সেরূপ যত কায়া, সকলি স্বরূপের ছায়া,
ভোজের বাজী ভেল্কি মায়া, কাজ ফুরায়ে ভগ্ন হয়।
সাগরে তরঙ্গ উঠে, রঙ্গেতে দিগন্ত ছুটে,
ফিরে এসে লাগে তটে, চিহ্ন কিছু নাহি রয়।
তেম্‌নি যত রূপের খেলা, কার্য্যকালে ধরে লীলা,
রূপ ভাঙ্গিয়ে রূপ উজলা, এক রূপে অনন্তময়।
রূপসাগরে দিয়ে ডুব, ভাব সেই নিত্যরূপ,
যে রূপে চিত্ত লোলুপ, অরূপ স্বরূপ এক দয়াময়। ৯৩ ॥

রাগিণী বাউলের সুর – তাল খেম্‌টা।

যাঁরে দেখ্‌তে আকুল, দেখ্‌বি যদি শুন্ বলি সন্ধান তাঁর,
দ্বিদলেতে দিল্ ধরিয়ে, মিল করিয়ে চেয়ে থাক মন আমার।
অরূপ স্বরূপ করে এক রূপ, হইয়ে প্রেম লোলুপ,
ভাবরে আরোপের রূপ, ছুটিবে আঁধার।
ফুট্‌বে কলি দীপশিখা, যা আছে সব যাবে দেখা,
তার ভিতরে বাঁকা সখা, দেখা পেতে পার তাঁর।
তারে তারে মিশালে তার, হবে আর এক চমৎকার,
তারের খবর আসবে তারে, জগৎ জোড়া একটী তার।
সাবধানে মন হুস্ নিয়ে, বক বিড়ালের খাপ্ দেখিয়ে,
চোখ্ মুদিয়ে ধ্যান ধরিয়ে, মন নিয়ে মন বস আমার।
শুন্ বলি কই তোরে ক্ষেপা, ভাবিস্‌নারে সোণা রূপা,
বশ করিয়ে বস অজপা, কৃপা হবে সেই অকৃপার।
মন তোমার নাই চিত্তশুদ্ধি, গেল না তোর ছেলে বুদ্ধি,
কিসে হবে সাধন সিদ্ধি, মনোমোহনের নাই বেপার। ৯৪ ॥

রাগিণী পিলু – তাল ঝাঁপ্তাল।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জোড়া, পরমাত্মা যদি হয় –
খণ্ড ভেবে কিসে লবে, বল তাঁরি পরিচয়।
সাকারে কি নিরাকারে, অখণ্ড ভাবে বিচরে,
খণ্ড করে কভু তাঁরে, ভাবনা উচিত নয়।
হয়ে খণ্ড ভেবে খণ্ড, হতেছ খণ্ড বিখণ্ড,
হাতে নিয়ে ব্রহ্মদণ্ড, দেখরে ব্রহ্মাণ্ডময়।
খণ্ডে খণ্ডে সে অখণ্ড, লীলাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড,
লীলার খণ্ড হলে পণ্ড, অখণ্ড কেবল রয়।
যত খণ্ড সব অখণ্ড, এম্‌নি তাঁর কৌশল কাণ্ড,
মনোমোহন কয় ব্রহ্ম অণ্ড, এক ভিন্ন দ্বিতীয় নয়। ৯৫ ॥

রাগিণী ভূপালী – তাল কাওয়ালী।

হরি তুমি পূর্ণ পুরাতন।
নিত্যই নূতন ভাবে দেখি তোমায়, যখন ডুবে আমার মন।
সাকার কিম্বা নিরাকার, করি না এই বিচার,
যখন ধর যে আকার, তাইতে ভুলে দুনয়ন।
তব অপরূপ রূপ, নিত্য নব রসকূপ,
রসিক চিত্ত লোলুপ, দেখিয়ে নিত্য নূতন । ৯৬ ॥

শ্যামা – সঙ্গীত

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল ঢিমা কাওয়ালী।

নমস্তে নিখিল মঙ্গলদায়িনী–
খুল আঁখিদ্বার সরাও অন্ধকার, আমি যে তোমায় দেখি জননী।
মলয় মরুতে লতাপাতা কাঁপে, আড়াল থেকে হাসে
ফুল কলি চুপে,
কোকিল কুহরে, শ্যামা দেয় শিস্‌, মধুকরে করে
গুণ্‌ গুণ্‌ ধ্বনি।
বনে বনদেবী ভুবন ঈশ্বরী, মন্দিরে মন্দিরে
প্রতিমা তোমারি,
হৃদয়ে হৃদয়ে, সদয়ে নিদয়ে, জাগিয়ে রয়েছ দিবস রজনী।
মনোমাঝে আছে যত আয়োজন, তোমারি শ্রীপদে
করিতে অর্পণ,
মনোমোহনের মন, অতি উচাটন, করগো গ্রহণ,
ভুবনমোহিনী। ৯৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল ঝাঁপতাল।

লীলা নিত্যময়ী তারা, শুভদে মা শুভঙ্করী।
তব কৃপা বিনে ভবে, কেমনে দিব পারি।
শক্তি সনাতনী আদ্যা, ভুবনে ভব আরাধ্যা,
ত্বং কালী করুণাময়ী, ত্বংহি মা ভুবনেশ্বরী।
যোগ নিদ্রা ত্যাগ করি, জাগ মা জাগ শঙ্করী,
করুণার রূপ ধরি, কিঙ্করে করুণা করি।
"ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা"
সদানন্দময়ী রাধা, বিঘ্ন, বাধা অপসারি।
ভাব কান্তি তুমি দেহ, রহিত ইথে সন্দেহ,

সন্তানে কর মা স্নেহ, নিজ মায়া সম্বরি।
আদরেতে আদরিণী, রাখ মা দিবা যামিনী,
কোলের শিশু ভুলে গিয়ে, ঘুম দিওনা পায়ে পড়ি। ৯৮ ॥

রাগিণী বারোয়া মূলতান – তাল কাওয়ালী।

কে বামা নিরুপমা শ্যামা, অধরে অলক্ত মাখা।
করতল চরণে অলক্তক বরণে, ভালে অলকা তিলকা।
কোটী শশী যিনি প্রভা, কে বলে আঁধার রূপা,
এ কালো সে কালো নয়, এ কালো আলোক মাখা।
দেখিয়ে তাঁর কিরণ, মোহিল যুগল নয়ন,
ভুলিল মনোমোহন, দূরে গেল বিভীষিকা। ৯৯ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী – তাল আড়া।

চিন্ত সে অচিন্ত্য ধনে, ওরে ও মন চিন্তামনি।
চিন্‌তে যাঁরে চিন্তা করে, অনন্ত বিশ্ব মেদিনী।
আলোক আঁধার গড়া, কিছুতেই না যায় ধরা,
নিরাকার সাকারা সে, সারাৎসারা সৌদামিনী।
নানাবর্ণে রূপভাতি, পূর্ণাহুতি শুভ্রজ্যোতি,
এ জগত কোলে লয়ে, জগতের কোলে যিনি।
প্রেমময়ী প্রেমভরা, প্রেমেতেই দিবে ধরা,
প্রেমে মজে প্রেমিকেরা, দেখেছে প্রতিমা খানি। ১০০ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

মা মা বলে ডাকিতেছি, মা জানি কেমন।
মহা ভয়ঙ্করী রূপে, হতে পারে না কখন।
যে কেহ বলনা যত, মা হবে মায়েরি মত,

দয়া মমতা গঠিত, স্নেহ বিরাজিত বদন।
মা শব্দে হৃদয় ছাঁচে, যেরূপ অঙ্কিত আছে,
তা বিনে আমার কাছে, লাগে না মায়ের মতন।
প্রসবিছে যেইরূপে, ভে'বে দেখ হৃদিকূপে,
একরূপে রয়েছে ডুবে, অনন্ত বিশ্ব ভুবন।
এরূপ সেরূপ ছায়া, সকলি তাঁহারি কায়া,
সামিপ্য সাধনে মায়া, তুচ্ছ কর মনোমোহন। ১০১ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল একতালা।

খেয়া দেয় ঘাটে, করুণা সুন্দরী।
চল যাই যাই, বেলাত ভাই নাই, যেতে হবে পারে, দিতে হবে পারি।

পেতে দিয়ে খেলা, করে অবহেলা,
গেল সারা বেলা, এখনে কি করি।
কর্ম্মেরি কৌশলে, মর্ম্ম নাহি খুলে,
ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে, অযথা চীৎকারি।
মান অপমান না হয় সমান,
স্বভাব বিজ্ঞান, করে ঝাকা জুরি।
কর্ত্তব্য প্রবল, জ্ঞান হত বল,
অন্তর চঞ্চল, আহা মরি মরি।
এ যাত্রা বিপদ, কুলগ্নেতে পদ,
বাড়া'য়ে সম্পদ, সম্বল কড়ি।
গিয়েছি হারায়ে, করুণা করিয়ে,
নিবে কি মা পারে করুণা সুন্দরী। ১০২ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল ঝাঁপতাল।

কোথা গো করুণাময়ী, করুণা কর কিঙ্করে।
হীনবল সাধনে আমি, দেখিতে না পাই তোমারে।
সংসারে দারুণ তৃষা, মিটে না মা এ পিপাসা,
দেখিছ বুঝি তামাসা, ফেলায়ে ভব গহ্বরে।
চারিদিকে হেরি শূন্য, তোমা বিনা নাহি অন্য,
কোথা গো জীবনের অন্ন, পাই না তো তালাস করে।
রুদ্ধ ভবিতব্য দ্বার, দেখা নাহি যায় আঁধার,
দিবে কি খুলিয়া তার, – কবাট করুণা করে।
এ যাতনা কুম্ভীপাকে, রক্ষ মা ঘোর বিপাকে,
মনোমোহন মা তোমাকে, সাধেগো চরণে ধরে। ১০৩ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী ঠেকা।

মনমসী করি নিবারণ –
মা তুমি চৈতন্যরূপে, হৃদে কর জাগরণ।
মা তুমি জাগিলে পরে, ভয় থাকে না এ সংসারে,
দেখা যায় মা বিশ্ব জুড়ে, শুনা যায় অপূর্ব্ব শ্রবণ।
সাধনে শকতি হীন, বাহ্য ভাবে মন লীন,
অপার হেরি সাগর, এক তুমি পারের কারণ।
সম্মুখে বহু সঙ্কট, সংগ্রাম হেরি বিকট,
সদা প্রাণ ছটফট, কর প্রকট রূপ ধারণ। ১০৪ ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল আড়া।

যুক্ত কর জননী গো জীবন সাধন।
আরাধনা যোগে আজি সহিত শরীর মন।
পৃথক অস্তিত্ব আর, থাকে না যেন আমার,
তোমাতে ডুবা'য়ে লও, করে তীব্র আকর্ষণ।

ঘুচা'য়ে মনের ব্যথা, দাও মাগো অমরতা,
আমরা সবে সরল মনে, করি আত্মসমর্পণ। ১০৫ ॥

রাগিণী বারোয়া পিলু – তাল যৎ।

মা আমারে দয়া করে, শিশুর মত করে রাখ।
শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে, বড় হ'তে দিও নাক।
সুন্দর সরল প্রাণ, মান অপমান নাহি জ্ঞান।
হিংসা নিন্দা ঘৃণা লজ্জা, কিছুই সে জানে নাক।
শাস্ত্র পড়ে জ্ঞানী হতে, সাধ নাইগো মা আর মনেতে,
লুকিয়ে থাকি তোর কোলেতে, ডাক্‌তে চাই মা শিশুর ডাক।
ক্ষুধা পেলে কাতর স্বরে, শিশু যেমন মা মা করে,
ভয় পাইলে নাহি ডরে, পাইলে মায়ের লাগ।
তেম্‌নি আমার শিশুর ধারা, করে রাখ জন্ম ভরা,
শরীর বাড়ুক ক্ষতি নাই মা, প্রাণটী আমার শিশু থাক্‌। ১০৬ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল আড়াঠেকা।

কইরে খোকা, ডাক্‌তেছে মা, আয়না ধেয়ে মায়ের কোলে।
পুতুল খেলায় ছিল খোকায়, ত্বরায় এল খেলা ফেলে।
অম্নি মোদের খেলা জুড়ে, রয়েছেন মা দূরে সরে,
মা কারোরে ডাক্‌লে পরে অম্‌নি যেতে হয় চলে।
কেউবা যদি খেলা ফেলে, কেন্দে উঠে মা মা বলে,
ছুটে এসে অম্‌নি কোলে, নেন্‌ মা তারে কুতূহলে।
আদরেতে স্তন্য দিয়ে, আচলেতে মুখ মুছায়ে,
শান্ত করে কত কয়ে, মিষ্ট কথায় তুষ্ট নইলে।
খেতে দেয় মাখন্‌ ছানা, পরতে দেয় কত গয়না,
তাতেও যদি মন উঠে না, অম্‌নি তারে শয্যায় ফেলে –
রাখ্‌তে চায় ঘুম পাতায়ে, কিন্তু যদি ঘুম না গিয়ে,

চোখ মুদিয়ে থাকে চেয়ে, হতে পারে এমন ছেলে।
কাছ থেকে মা দূরে গেলে, অম্‌নি আবার মা মা বলে,
মনোমোহন কয় তাহা হইলে, থাক্‌তে পারে কোলে কোলে। ১০৭ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল একতালা।

মন যাবি যদি মায়ের কোলে।
সরল মনের গরল অংশ, বেছে বেছে দে না ফেলে।
কাম, ক্রোধ, পশুগুলি, মায়ের নামে দে না বলি,
মনপ্রাণ দেহ ঢালি, পিয় মধু তত্ত্ব ফুলে।
আমার আমার আমি বা কার, চিন্তা কর তাই অনিবার,
ফাঁক দিও না লাগ পাবে তাঁর, ডাক দিও ভাই মা মা বলে।
মনোমোহনের মন পাজী, আসল কাজে হয় না রাজী,
হাল ছাড়িয়ে দিলে মাঝি, পাক ফিরে নাও ঢেউয়ের জলে। ১০৮ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল একতালা।

একবার আমায় দে মা ছুটি।
গারদ হইতে বাহির হ'য়ে, শ্রীপদ সুধা মধু লুটি।
জেলখানাতে কয়েদ হয়ে, কর্‌ছি কেবল লুটালুটি,
ছয় প্যাদাতে মশিল করে, তাদের সঙ্গে নাহি আটি।
রং বাজারের রঙ্গের ঘরে, রঙ্গের বড় পরিপাটী,
খেলছি সদায় পুতুল খেলা, হয়ে আমি কাঁচাগুটী।
ভবের মেলায় ধূলা খেলায়, দেখি কেবল লাঠালাঠি,
উজান পথে যেতে তারা, টেনে কেবল লামায় ভাটী।
মন বুঝেনা একদিন যে তার, বাঁধবে গো মা খাঁটি পাটি,
অষ্টপাশে বদ্ধ হয়ে, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।
মনোমোহন কয় এই কর মা, খাদ্‌ কেটে মা কর খাঁটি,

শিশু বলে শিরে তুলে, দে মা রাঙ্গা চরণ দু'টি।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, পাষাণ হয়ে রইলি বেটি,
নয়ন জলে পাষাণ গলে ফুটাও তুমি আমি ফুটি। ১০৯ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল ঠুংরী।

কে বলে শ্যামা মা কালো,
রূপ ধরেছেন জগত আলো।
মায়ের চরণ তলে, ভাঙ্গ খেয়ে বব, বম্‌ বলে,
বাবা পড়তেছেন ঢলে, বাজায়ে গাল।
সঙ্গে ভূত প্রেত নাচে, আর যে যেখানে আছে,
তাথৈয়া, তাথৈয়া বাজে, ডুম্বুর তাল।
ভব বিভোর ভাবে, নাচে মাতায়ে সবে,
বিশ্ব ত্রাসিত রবে, কাঁপে মহাকাল।
কালবারিণী কালী, অসুর দল দলি,
রূপে ভূবন উজলি, বসেছে ভাল।
দাস মনোমোহনে, আকাঙ্ক্ষিত সদা মনে,
বারিত করি শমনে, পাইতে চরণ তল। ১১০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

কে তুমি, ভয়ঙ্করী রূপে, এস না আমার কাছে
শিশু তোমার ভয় পাবে মা, দেখা দে মা মায়ের সাজে ॥
বীরভাবে ভাবে যারা, তাদের কাছে যেয়ে তারা,
মুণ্ডমালা অসিধরা, হয়ে বেড়াও নেচে নেচে।
আমি যখন মা মা বলে, ডাক দিব মা মনে হলে,
মা যেমন মা শিশু ছেলে, কোলে নিতে এ'সে কাছে –

আগু হয়ে কোলে লয়, মুখপানে চেয়ে রয়,
হাত বুলায়ে কত কয়, চেপে ধরে বুকের মাঝে।
সুমধুর সে স্নেহ ভাষে, কান্দা মুখে শিশু হাসে,
স্তন্যপানে অবশেষে যত অবসাদ ঘুচে।
সে রূপেতে মা তোমায়, মনোমোহনের মন চায়,
কৃপা কি হইবে তায়, উদয় হবে হৃদয় মাঝে।
যে ভাবে তুই জগন্মাতা, সে ভাবে শুন দুঃখের কথা,
রামপ্রসাদের এই কথা, কু মাতা নাই জগৎ মাঝে। **১১১ ॥**

রাগিণী সুরট মল্লার –তাল আদ্ধা।

যার যা ইচ্ছা বলুক তোমায়, আমার কেবল মা বলা।
ব্রহ্মময়ী মা তুমি মা, ব্রহ্মাণ্ড ভাবের গোলা।
যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে, বসে থাকুক তারা গিয়ে,
শ্রীপদে সব সমর্পিয়ে, আমি চাই শিশুর খেলা।
বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে, জপ, তপ, হোম, ধ্যানে,
চাই না তোমার আকর্ষণে, পাইতে সিদ্ধির ঝোলা।
শ্মশানে কি শবাসনে, মন্ত্র জপি রাত্র দিনে,
কাজ কিগো মা তোর কারণে, করুক অন্যে সেই গুলা।
আমি কেবল ভাবাভাবে, তোমারে ল'য়ে স্বভাবে,
থাক্‌তে চাই মা শিশুর ভাবে, কান্‌দতে চাই সারা বেলা।
মা যদি মা হয়ে থাক, রূপেতে প্রাণ ভরে রাখ,
ডাক দিয়ে মা শিখাও ডাক, খুলে দে ত্রিবেণীর তালা।
মনো ডাকো মা মা বলে, দোষ নাই শিশুর কোনকালে,
কোলের ছেলে নে মা কোলে, নইলে তার ভাঙ্গল গলা। **১১২ ॥**

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল ঝাঁপ।

তোর ছেলে মা তুই সামলে রাখ্।
দুষ্ট ছোড়া, বেড়ায় পাড়া, একটু খানি পেলে ফাঁক্।
নাহি বুঝে হিতাহিত, হিতে ঘটায় বিপরীত,
বিহিত করা হয় উচিত, সময় মতে দিতে ডাক্।
কত কিছু ভাঙ্গে গড়ে, যার তার সনে কোন্দল করে,
ডাক্ না শুনে মেরে ধরে, শক্ত করে, বেঁধে রাখ্।
মায়ার আদর ভাল নয়, পুত্র যদি মূর্খ হয়,
মা বাপেরে মন্দ কয়, নিবে কি মা মন্দের ভাগ।
মনোমোহন অবাধ্য ছেলে, বাধ্য করে নে মা কোলে,
কি জানি হয় তা না হইলে, নৈলে কাছে কাছে থাক । **১১৩ ॥**

রাগিণী বাউলের সুর – তাল তুরখেম্‌টা।

আমি কি তাঁর সঙ্গ ছাড়া হই।
যে জন কাতর প্রাণে ডাকে আমায়, মা কই, মা কই।
হৃদয়ে জাগায়ে জাগে, নামে প্রেমে মাখা থাকে,
আর কিছু না দেখে চোখে, এ ব্রহ্মাণ্ডে আমি বই।
অন্য কথা কয় না মুখে, ব্যথিত হয় সে ব্যথিত দেখে,
সমান থাকে সুখে দুঃখে, লোকের নিন্দা শুনে কই।
শিশুর মতন স্বভাব ধ'রে, মা বলে যার আঁখি ঝরে,
পারি কি তায় থাক্‌তে ছেড়ে, অম্‌নি এসে কোলে লই।
মনোমোহনের মন দুরাচার, শিশুর মতন স্বভাব কই তার,
মায়ের স্নেহের নাই পারাবার, মা আমার ঠিক আমি মার নই। **১১৪ ॥**

রাগিণী সাহেনা – তাল যৎ।

আমি যা হতে চাই, তাই দিবে না, তাতেই কেবল ধর্‌বে আড়ি।
অপূরন বাসনা লয়ে, আমি ত আর রইতে নারি।
কচি কচি বেঁ'দের মেয়ে, পুতুল খেলায় আমায় লয়ে,
রূপ রঙ্গে ডালি সাজায়ে, পাগল বানায় নয়ন ঠাঁরি।
রসময়ীর আঁখি ঠারে, চমকিয়ে চিত্ত ঘুরে,
ধর্‌তে গেলে আড়ে আড়ে, হেসে করে গড়াগড়ি।
কি বালাই লেগেছে বালা, আর সহে না দেখ জ্বালা,
হক্‌সে আমার গলার মালা, আমি হই তার বাঁশরী। ১১৫ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফী – তাল কাওয়ালী আড়াঠেকা।

ওগো ! বিদেশিনী বালা –
আর ভাল লাগে না আমার, ওরকম সব ছায়া খেলা।
ওগো বাজীকরের মেয়ে, অম্‌নি করে ধোকা দিয়ে,
আমায় ভেল্কি দেখাইয়ে, কাটিয়ে দিবি সারা বেলা।
সাধন দিয়ে মনের মত, কর চির পদানত,
চাহে সেবক সদাব্রত, সতত আনন্দ মেলা। ১১৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল আড়া।

অসুরে বিনাশে সুরপুরী।
সাজ মা সমরে শ্যামা, রণ-বেশে অসি ধরি।
মন মত্তকরী অরি, শ্রীপদে দলিত করি,
শব শিব জীব কায়, আরোহণে ভয়ঙ্করী।
শত্রুদল বিনাশিতে, সত্বরা হও মা অসিতে,
স্বপক্ষে অপরাজিতে, শুভদে মা শুভঙ্করী। ১১৭ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

জগত জননী জাগো, জাগো মাগো দয়া করে।
কোলের ছেলে আকুল হয়ে, কাঁদে গো মা ধূলায় পড়ে।
খেল্‌তে দিয়ে দিলে ঘুম, দেখে খেলার ধূমাধূম,
ভয় পেয়ে এসেছি ধেয়ে, কোলে যাব খেলা ছেড়ে।
ডেকে ডেকে হলেম অধীর, শুন্‌লে না হয়ে বধির,
এমন মায়ের উচিত নয় যে, সন্তান প্রসন করে।
বুঝে না যে পুত্রের ব্যথা, মা হওয়া তার নয়গো কথা,
যোড়া দিলি পুণার মাথা, বেঁধেছিল সে তোরে।
রামপ্রসাদের বাঁধলি বেড়া, আমি কি তোর কেও নই তারা,
মনোমোহন তোর দুষ্ট ছোড়া, ঠিক করে দে লাথি মেরে । ১১৮ ॥

রাগিনী বিভাস – তাল আড়াঠেকা।

জাগ মা জাগ মা জাগো, জাগো জগজ্জননী।
কুলাও মা কুলাও মা কালী, কুলাও কুলকুণ্ডলিনী।
জাগো মাগো মা মা বলে, কান্দেগো, তোর কোলের ছেলে,
আছাড় খেয়ে প'ড়ে ধূলে, বুক বেয়ে তার ঝর্‌ছে পানি।
না পেয়ে মা মায়ের দিশা, কেন্দে কেন্দে করছে গোসা,
অম্‌নি ছেলের মায়ের নিশা, মা নৈলে বাঁচে না প্রাণী।
শিশুর জীবন মায়ের কাছে, মা নৈলে কি শিশু বাঁচে,
মনোমোহনের মন ছুটেছে, ডাক দিতেছে জাগ জননী। ১১৯ ॥

রাগিনী বেহাগ – তাল আড়া।

দীন হীনের কান্না শুনে, দয়া যদি হয় তোমার।
আনন্দে আনন্দময়ী, দূর করে দাও দেহ বিকার ॥
কূল পেতে পড়ে অকূলে, হারায়েছি লাভে মূলে,
মা এসে মা লওগো কোলে, দূর কর মা দুঃখভার।
দুঃখ পে'লে মা আশে পাশে, মা কথা মা আপনি আসে,
আছাড়া খেলে লোকে হাসে, মা না এ'সে সাধ্য কি মার।
কেউ না যারে দেখ্তে পারে, তারেও মা আদর করে,
মনোমোহন তাই আছে প'ড়ে কর বা না কর পার। ১২০ ॥

রাগিণী পিলু – তাল পোস্ত।

মা তুমি মা আমি তুমি, করুণা যাচে কিঙ্করে।
হীনবল সাধনেতে, হৃদয় পূর্ণ বিকারে।
প্রেম সুরধনী জলে, সিঞ্চিয়া মা কুতূহলে,
আশা শুষ্ক-হৃদ্কমলে, ফুটায়ে দেহ অচিরে।
জ্ঞানে দিব্য ভার দিয়া, সামীপ্য সাধন আনিয়া,
সবল করিয়া হিয়া, মাতায়ে তুল আমারে।
মা তুমি মা আমি তুমি, জানিতেছ কি চাই আমি,
ক্রীতদাস অনুগামী, আনন্দ চাহে অন্তরে।
প্রাণে প্রাণ দিয়ে ধরা, বরিষ অমৃত ধারা,
আমি যে তোমাতে গড়া, হারায়ে কেন তোমারে।
ত্রিতাপ দগ্ধচিত, আকুলিত অবিরত,
সতত সাধন ব্রত, কিঙ্করে করুণা করে।
রক্ষ বা ভুবনেশ্বরী, কাতরে প্রার্থনা করি,
দাও মা চরণতরী, তরিতে ভবসাগরে। ১২১ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

পুরাণ কথা জাগা'য়ে দেরে, নুতন হয়ে উঠুক্ ভেসে।
শ্যামা আমার আহলাদিনী, নাচুক এসে হেসে হেসে।
প্রাণ ভরা এক মা ডাক দিয়ে, তোল মারে জাগাইয়ে,
মা তোমারে কোলে লয়ে, ঘুম পাতা'য়ে আছেন বসে।
থাকিয়ে ভাবির ভাবে, টেনে আন স্ব স্ব ভাবে,
কি করিবে আর অভাবে, অভাব নাইরে সেই দেশে,
দয়াময় নামের গুণে, ভালবাসা বিতরণে,
লাগিল ক্ষিতি বিমানে, চন্দ্র সূর্য্য দুই হাসে।
কহিছে মনোমোহন, প্রেমেতে হলে মগন
পুরাণ কথা হয় নূতন, আলোকে আঁধার নাশে। ১২২ ॥

রাগিণী বাহার – তাল কাওয়ালী।

মনের বল দাও মাগো, সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।
সন্দেহ করিয়ে দূর, নির্ভয় কর জননী।
দেখিয়ে ভ্রুকুটি তব, মানি সদা পরাভব,
কি আছে জীব বিভব, শিব হইল শব আপনি।
শব্দ স্পর্শ রূপে রসে, হয়ে আছি হারা দিশে,
শক্তিশালী হব কিসে, মিশে না হৃদয়খানি।
ছাড় মায়া হেরি কায়া, আমি যে তোমারি ছায়া,
তুমি সতীপতি জায়া, ঘরে ঘরে আহলাদিনী। ১২৩ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল আড়াঠেকা।

মঙ্গলামঙ্গল তুমি, কাল কুলিক রজনী।
শিবাশিব ভাবে শিবে, অশিব নাশ জননী।
ভাল মন্দ তোমা হতে, জনম লভি জগতে,
নিয়ত ঘূর্ণী বায়ুতে, ঘুরিছে দিবা যামিনী।
অনন্ত জগত জীব, ভুলিয়ে আপন শিব,
সতত অশান্তি ভরে, করিছে অস্ফুট ধ্বনি।
ছোট বড় জীব যত, অস্থির আছে সতত,
মধ্যবিন্দু হারা হয়ে, কেন্দ্র ভ্রষ্ট যত প্রাণী।
আমিও সে ঘূর্ণিপাকে, ভুলিয়াছি আপনাকে,
তাই ডাকি গো মা তোমাকে, দিও না দুঃখ সর্ব্বাণী। ১২৪ ॥

রাগিণী ললিত – ঝাঁপ তাল।

চেয়ে দেখ নিবাসেতে, স্নেহময়ী মা তোমার –
কোলে থেকে মা মা বলে, কেন কান্দ অনিবার।
সমাদরে আদরিণী, আহলাদিনী সে কামিনী,
বক্ষে নিয়ে পুত্র কন্যা, সাজিয়াছে পরিবার।
আঁধারে আলোক রাশি, খেলিতেছে হাসি হাসি,
কি সুন্দর মেশামিশি, জাতিবর্ণ একাকার।
সর্ব্বশক্তি থরে থরে, বিরাজিত ঘরে ঘরে –
জগন্ময়ী মা তোমারি, এ বিশ্ব সন্ততি তাঁর। ১২৫ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

লীলাতে লুকায়ে আর, থে'কনা মা কুতূহলে।
আনন্দে আনন্দময়ী, কেলি কর হৃদ্‌কমলে।

লীলাতে লুকায়ে অঙ্গ, আর করো না আমায় ব্যঙ্গ,
ছেড়ে দে মা এ প্রসঙ্গ, রঙ্গ ছেড়ে নে মা কোলে।
রঙ্গিণী তোর রঙ্গের ফেরে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে,
তারে ঘুরাও কি করে মা, যে তোমারে নাহি ভুলে।
পিতার বাক্য ক'রে ঐক্য, মা তোমায় করেছি লক্ষ্য,
এ দুস্তরে রক্ষ রক্ষ, মনোমোহন তোর অবোধ ছেলে। ১২৬ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী – তাল মধ্যমান।

কেন গো তুই শ্মশানবাসিনী।
কোন্ পাগলের প্রেমে পড়ে, হলে পাগলিনী।
রক্ত বস্ত্র কটীতটে, নয়নে আগুন ছুটে,
এলোকেশে ছদ্মবেশে, উন্মাদিনী কার কামিনী।
কার ভাবে কি ভেবে মনে, যোগিনী যোগ সাধনে,
ঘর ছেড়ে এলে শ্মশানে, ওগো শ্মশান বাসিনী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যারে, যোগে আরাধনা করে,
সে জানি কাহার তরে, পাগলিনী নাহি জানি।
চিতা করে ধূ, ধূ, ধূ, ধূ, কুল ত্যাজিয়ে কুলবধূ,
মরার মাথায় পিয়ে মধু, আবেশে অবশাঙ্গিণী।
লোল জিহ্বা অসি ধরা, মুণ্ডমালা গলে পরা,
লক্ষ্মী মা তুই লক্ষ্মী ছাড়া, কার লাগিয়া বল মা শুনি।
যার লাগিয়ে সে ত ভুলে, পড়ে আছে পদতলে,
মুখে ববম্ ববম্ বলে, আগুন জ্বলে খেলে ফণি।
তবে কেন পাগল পারা, বল মা তারা একি ধারা,
মনোমোহন আত্মহারা, হৃদে ধরে চরণখানি। ১২৭ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফী – তাল কাওয়ালী।

মায়ের গলে নয়তো মুণ্ডমালা,
জগতবাসী ছেলে মেয়ে, জড়িয়ে ধর্‌ছে মায়ের গলা।
কেও কোলে কেও বক্ষোপরে, কেও রয়েছে আঁচল ধরে,
কেওবা আবার নে'মে পড়ছে, দেখি এ সব ভোজের খেলা।
কেহ কেহ খেলছে বসে, খেইল ছেড়ে কেও কান্দছে শেষে,
কেওবা হয়ে হারা দিশে, ঘুমিয়ে পড়ছে খেলার বেলা।
মায়ের রূপে ভুবন ভরা, মায়ের রূপে ভুবন গড়া,
কোলে রাখ্‌ছে দেয় না ধরা, অমনি মায়ের গুপ্তলীলা।
ঢেলা ভাঙ্গিতে মারছে ঢেলা, ভাব নিয়ে ভাব করছে খেলা,
মনোমোহন কয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাগল গুরু পাগল চেলা। ১২৮ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল ঠুংরী।

মা বলে মা তোমারে ডাকিলে –
আনন্দ উথলে প্রাণে, পাষাণ হৃদয় যায় গলে।
মা ডাকে নাই বাদাবাদি, কোরাণ পুরাণ বেদ বাইবেলে,
সন্তানে মা কান্দলে বসে, মুখ মুছায়ে দাও আঁচলে।
মা তোমার কি মা বাপ আছে, নাম রেখেছে শিশুকালে,
জগত-জননী তুমি, জগৎবাসী, মা মা বলে।
ভক্ত তোমার মাতা পিতা, জন্মদাতা কালে কালে,
যেই ভাবে নাম রাখে তোমার, সেই ভাবে হও মেয়ে ছেলে।
মনোমোহন কয় কালী কানাই, পিতা মাতা বন্ধু কি ভাই,
ভাশুর, দেবর, শ্বশুর, জামাই, সকলি তোমার লীলে।
বৌ জামাই মা তোমার খেলা, যা দেখি মা ভূমণ্ডলে,
শিশু হ'য়ে আপ্‌নি আবার, জড়িয়ে ধর আপন গলে।
এক প্রেমেতে জগৎ বাঁধা, প্রেমেতেই জগৎ চলে,
সব ছাড়ায়ে যেতে পার, ধরা পড় প্রেমের কলে। ১২৯ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল একতালা।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা,
তুমি আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে।
একস্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।
ভূজঙ্গরূপা লোহিতা স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর নাভি স্থান,
অনাহত বিশুদ্ধাখ্যা বরে।
বর্ণ রূপা তুমি বট বস্‌ বল, তক, ফঠ,
ষোলস্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হক্ষ আশ্রয় ভুরু নিতান্ত কহিলাগুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে। ১৩০ ॥

কৃষ্ণ–বিষয়ক সঙ্গীত

রাগিণী ভৈরবী – তাল একতালা খেম্‌টা।

হারেরে কানু, বাজায়ে বেণু, আয়না ধেনু চড়াতে যাই।
পূরব গগণে, উজল কিরণে, ভাতিছে ভানু রাঙ্গা দেখা যায়।
কুসুম কাননে, মলয় পবনে, হেলিয়ে দোলিয়ে খেলায়ে যায়,
মধু ভরা মধু, ফুল কূল বধূ, প্রভাতে জাগিয়ে, প্রণতি জানায়।
শাখে শাখে পাখী, ডাকে থাকি থাকি, আকুলি কোকিল
পঞ্চমে গায়,
গাল ভরা হাসি, বড় ভালবাসি, হাসিয়ে হাসিয়ে নাচিয়ে আয়।
তোরে লইয়ে সাথে, যাব বনপথে, খেলব কত খেলা,
বেলা বেড়ে যায়,
মায়ের কোল ছেড়ে, উঠরে উঠরে, আমরা ভাই
তোরে প্রাণে চায়।
বাঁশীটি বাজাবি, হাসিটি খেলাবি, যমুনা দোলাবি, দেখিব তায়,
ত্রিভঙ্গে ভঙ্গিম, রূপে অনুপম, মনোমোহন তোরে দেখিতে চায়। ১৩১ ॥

রাগিণী লগ্নি – তাল যৎ।

অই শুন বাজে বাঁশি, যমুনা পুলিনে।
নিঝুম্ রেতে কাণ পাতিয়ে, তাকাইয়ে তাঁরি পানে।
থাকিয়ে তাকে তাকে, ধর মন মন-চোরাকে।
ফাঁদ পাতিয়ে ফাঁকে ফাঁকে, ফাঁক দিলে আর পাবিনে ॥
বাঁশীতে হয়ে উদাসী, লাগায়ে দাও প্রেমের ফাঁসি.
অধর চাঁদ আপনি আসি, হাসি দিবে প্রাণের কোণে।
সে হাসিতে ভাবে বসি, দেখ্‌তে পাবে কালশশী,
দু'করে ধরিয়ে বাঁশী, বাজাইছে রাত্র দিনে।

দেখলে কৃষ্ণ দেখ্‌বে রাধা, রাধা তার অঙ্গেরই আধা,
স্মরণ কর তত্ত্বকথা, কৃষ্ণ কি হয় রাধা বিনে।
যুগল দেখে পাগল হ'য়ে, মন আমার থাক মজিয়ে,
কাজ কি অন্য স্বভাব দিয়ে, স্বভাব ধর ভাবের টানে।
যোগেতে করি সংযোগ, যোগে জাগি ভাব যোগ,
মনোমোহন হয় বিমুখ, কেবল তার স্বভাবের গুণে। ১৩২ ॥

রাগিণী পরজ কালেংড়া – তাল ঠুংরী।

সকল দুঃখ অপসারি –
বাজাও বংশী হৃদে নাথ ! ওহে বংশীধারী।
যে রবে নীরব ভব, অনাহত সেই রব,
শুনিতে সাধ বড়, যুগল শ্রবণ ভরি।
যে নাদে নাদে ভুবন, যে নাদে বিশ্ব মগন,
মধুর মধুর সেই,বাজাও বাজাও মধুর ভেরী।
নিদ্রিতেরে জাগাইতে, হবে ভেরী বাজাইতে,
জাগাও জাগাও নাথ ! বাজাও মুরারী। ১৩৩ ॥

রাগিণী মিশ্র – তাল খেম্‌টা

বাজে বাঁশী, মন উদাসী, দেখে আসি, ত্রিভঙ্গ।
তমালতলে, কদম্বডালে,রাধা রাধা বলে করিছে রঙ্গ।
মোহন তানে, সহচর সনে, সতত পিরীতি প্রসঙ্গ,
দেখিতে সে রূপ, চিত্ত লোলুপ, ব্যাকুল অতি প্রাণবিহঙ্গ।
মদনমোহনে, মনোমোহনে, চাহিছে সদা লইতে সঙ্গ। ১৩৪ ॥

রাগিণী বারোয়া মূলতান – তাল কাওয়ালী।

বাঁশী বাজিলে কি হবে –
আমিতো শুনি না বাঁশী, যে শুনে সে যাবে।
যে থাকে বাঁশীর তাকে, বাঁশী শুধু তারে ডাকে,
জান্‌তে দেয় না আর কাকে, বাজে বাঁশী ভাবে ভাবে।
যে জানে প্রেমের হরি, সে ত কালার বাঁশী ধরি,
প্রাণ রাধার মন করে চুরি, হরে কৃষ্ণ হরে রবে।
ভাব কৃষ্ণ প্রাণ রাধা, কৃষ্ণ ভাবে ভাব রাধা,
রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা, ভাব কৃষ্ণ রাধা ভাবে।
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, জান নাকি মনোমোহন,
ভাবে কর আকর্ষণ, মন দিলে মন ঠিকই পাবে। **১৩৫ ॥**

রাগিণী কালেংড়া– তাল খেম্‌টা।

চুপি চুপি খেলা কর হৃদয় আড়ালে বসি –
কখন বা ভ্রুকুটি দেও, কখন মধুর হাসি।
কখন বা সরা'য়ে রাখ, কখন কাছে যেতে ডাক,
কখন প্রাণে প্রাণমাখ, প্রেমেতে বাজা'য়ে বাঁশী।
কখন থাক দূরে সরে, তালাস করে পাই না তরে,
আবার এ'সে অগ্নি করে, ঢেউ দিয়া যাও জলে ভাসি।
মনো কয় তোর ভালবাসা, আমার পক্ষে মিছা আশা,
মন হলে খান্দানি চাষা, পার্‌ত কিছু রাখ্‌তে খুসী। **১৩৬ ॥**

রাগিণী পিলু – তাল কাশ্মীরি খেম্‌টা।

ভালবাসি ব'লে রে শ্যাম, এত দাগা স'য়ে থাকি।
নৈলে কি আর সইত এত, ভাঙ্গ্‌ত খাচা উড়ত পাখী।
তোমার আমার ভালবাসা, যেমন মহাজনের সুদকষা,
কম হইলে তার রতি মাষা, উলটিয়ে থাক আঁখি।
ভেবে কয় মনোমোহন, ম্যাদের সংখ্যা নাই নিরূপণ,
ঋণ ফুরায় না জন্ম মরণ, সুদের সুদ তার থাকে বাকী।
কয়বার বাকী কয়বার টান, এ বাকীর আর নাই ফুরান,
জমা খরচ করে সমান, চোখ মুদিলে সবই ফাঁকি। **১৩৭ ॥**

রাগিণী কালেংড়া – তাল আড়াঠেকা।

যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি –
তারে ডাকলে শুধু পেয়ে থাকি, প্রাণ ভরা এক মধুর হাসি।
ডাকিয়ে আপনা হারা, আনন্দ প্রবাহে ধারা,
অবিরল বেগে ছুটে, মাতায়ে করে উদাসী।
আপনি আপন হতে, কি জানি চাহি ধরিতে,
ধরি ধরি দেয় না ধরা, আড়াল থেকে বাজায় বাঁশী।
আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটে, চকোরিণী মধু লুটে,
দেখরে মানুষ ঘটে, সমুদিত পূর্ণশশী। **১৩৮ ॥**

রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিট – তাল খেম্‌টা।

চাপ্‌লে কি রয় প্রাণের হাসি, ঠোঁটের কোণে ফুটে পড়ে।
প্রাণ উদাসী তাইত আসি, ভালবাসি তোমারে।
ঢাক্‌লে কি রয় মনের ভাব, আপনি খুলে প্রেমের স্বভাব,

প্রাণে প্রাণে মধুর টানে, আঁখির কোণে রাখে ধরে।
দু'জনাতে টানাটানি, উথ্‌লে উঠে মনের মণি,
ঝর্‌তে থাকে চোখের পানি, প্রাণ দিলে প্রাণ দেয় ফিরে। **১৩৯** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল খেম্‌টা।

প্রাণ ছুটে প্রাণ ধরে আনে, প্রাণের কাছে দিতে প্রাণ।
প্রাণে প্রাণ না মিশিলে, হয় কি কভু প্রাণ জুড়ান।
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি, ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি,
তাইত বড় ভালবাসি, সজল হাসি বয়ান।
মেঘেতে বিজলি খেলে, পুলকে প্রাণ উথলে,
তাইতে মনো প্রাণ খুলে, ধরিতে চাহে পরাণ। **১৪০** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

আঁখি নীরে টেনে আনে, প্রাণের প্রাণ কাছে।
চোখের জল আর প্রাণের টান, তা বিনে কি মন্ত্র আছে।
প্রাণ ভরা করুণ স্বরে, প্রেম ভরে ডাকলে পরে,
অম্‌নি এসে হেসে হেসে, আনন্দে অন্তরে নাচে।
খেলায় খেলে প্রাণ পুতুল, দোল্‌ দোলাদোল্‌ দোদুল্‌ দোদুল্‌
যে দেখেছে তার সেই দোল, মায়ের কোল ছেড়ে দিছে।
আভাস পেয়ে মনোমোহন, গাছতলাতে কর্‌ছে রোদন,
ছুট্‌বে কি তার কর্ম্ম বন্ধন, জন্ম মরণ যাবে ঘুচে । **১৪১** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাহারবা।

ছল ছল আঁখি মম, কি জানি কি চায় রে।
পুছিলে আঁখির কাছে, আঁখি না জানায় রে।
আমি কত করে বলি তায়, অধর কিরে ধরা যায়,
সে কথা না শুন্‌তে চায়, কেবলি তাকায় রে।
পাইতে মন মানুষে, মন আমার আছে তালাসে,
পায় না তারে অবিশ্বাসে, করি কি উপায় রে।
ধরিতে মনোমোহন, ব্যাকুল মনোমোহন,
আঁখি মনপ্রাণ তার, সঁপিয়াছে তায় রে। **১৪২** ॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল – একতালা খয়রা।

অন্তরে আনন্দ সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা।
রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ স্বভাবেতে গাঁথা।
কালী কালী মহাকালী, নিধুবনে কৃষ্ণকালী,
শিবকালী দুর্গাকালী, কালরূপে বাঁধা।
কামকালী প্রেমকালী, লীলাকালী নিত্যকালী,
জগৎ জোড়া আঁধার কালী, কালরূপ সুধা।
দর্শনেতে চমৎকার, একরূপে বহু আকার,
কালীর কলি ফুট্‌লে পরে, রং ধরে সে সাদা। **১৪৩** ॥

শিব সঙ্গীত

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঝাঁপতাল।

ভাবরে মন ভবেশ, ভব ভয় নাশক।
ঈশান বিষাণধারী, প্রলয় শিঙ্গা নাদক।
বাঘাম্বর পরিধান,
শূলীশম্ভূ পঞ্চানন,
কম্বুগ্রীব নীল কণ্ঠ, ভালে শশী পাবক।
সুমণ্ডিত জটাজুট,
ফণীফণা লটপট,
স্বরাট বিরাটরূপ, শিব শিব দায়ক।
ত্রিপুর দহনকারী,
কন্দর্প দরপহারী,
ধূর্জ্জটী পিণাক পাণি, শূলী শ্মাশান শায়ক।
শ্বেতকায় মনোহর,
বিভুতি ভূষিত হর,
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর, সকল দুঃখ হারক।
ভূতপতি ভূতনাথ,
ব্যোমকেশ বিন্দুনাদ,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অণ্ডে, অনাদি আদি নায়ক।
গিরিজাপতি গিরীশ,
জাহ্নবী ধর যোগেশ,
বৃষভ আরূঢ় হর, নরশির ধারক।
ভো ! দেব, তব আরতি
অজ্ঞান অতি অকৃতি,

সুর, তাল, লয় হীন, মনোমোহন গায়ক।
আশুতোষ আশুতোষ,
ক্ষম মম যত দোষ,
শুভঙ্কর হে শঙ্কর, শিব সুবিধায়ক। ১৪৪ ॥

রাগিণী কেদারা – তাল ধামাল।

ভাং খেয়ে বিভোর ভোলানাথ, ববম্ ববম্ বাজায় গালে।
তালে তালে দুলে দুলে, ভবানীর পায় পড়ে ঢলে।
ভস্মমাখা কলেবরে, আঁখি ঢুলুঢুলু করে,
ব্যঘ্র চর্ম্ম কটীপরে, রুদ্রাক্ষ দুলিছে গলে।
ভূত প্রেত যত আছে, তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে,
ফণী ফণা ফুৎকারিছে, চন্দ্রমা শোভিছে ভালে।
পশুপতি পাগলপারা, বহে মন্দাকিনী ধারা,
পবিত্র প্রেম বিভোরা, প্রণতি পদ যুগলে।
আশ্রয় নিয়ে বিল্বমূলে, তরে ব্যাধ অবহেলে,
সেই ভরসায় তব গুণ গায়, ব'সে মনো বিল্বতলে। ১৪৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাওয়ালী।

ভূত ভাবে আবরিত কত বা রাখিবে আর
ভূতপতি ভূতনাথ করহে ভূত উদ্ধার।
প্রকৃতি আঁচল দিয়া, রেখেছে মুখ ঢাকিয়া,
পারি না তার লাগিয়া, লভিতে সাধন সার।
যা কিছু উঠে তরঙ্গ, তোমারি ভ্রুকুটি রঙ্গ,
দয়া করি এ প্রসঙ্গ, ভঙ্গ কর এইবার।

স্বগুণে বিম্ব উতালা, নির্গুণে বিশ্ব উজলা,
ভূতে ভূতে নিত্য লীলা, সম্মুখে গ্রাসে আঁধার।
সংযোগ কর সাধনে, আত্মতত্ত্ব ফুটাও প্রাণে,
সেবকত্ব শ্রীচরণে, দয়াতে দেহ এবার। **১৪৬** ॥

রাগিণী কেদার – তাল কাওয়ালী।

কৈবল্য কেবলং শিব তোমারি মধুর নাম।
সত্যমতি সুন্দরং অমৃতময় প্রাণারাম।
অনুপমরূপ ভাতি, হৃদয়ে প্রকাশ জ্যোতি,
অদ্বৈত শান্তমানন্দং পরিপূর্ণ পূর্ণকাম।
স্বরগ্রাম সম্পূরণ, বেদবেদান্ত গান,
আদি জ্যোতি কল্যাণ, নয়নের অভিরাম।
মহাশক্তি সংযোগেতে, খেলিতেছে ভূতে ভূতে,
এক হইতে বহুতে, বহুতে এক বিরাম।
উপনিষদ দর্শন, পাতঞ্জল বিবরণ,
অবিষয় কর্ম্ম স্রোত, কর্ম্মেতে কৈবল্য বাম।
ইচ্ছাতে সঙ্কল্প সিদ্ধি, অন্তর পরম শুদ্ধি,
নহে কভু হ্রাস বৃদ্ধি, সাধনে সিদ্ধ আরাম। **১৪৭** ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী – তাল আড়াঠেকা।

জীবে শিবে কত প্রেম জানাব তাই কেমনে।
অভেদ প্রভেদ হীন, বেদ বিধি পুরাণে।
শিবত্ব পরম কান্তি, জীবত্ব মায়ার ভ্রান্তি,
লীলাচ্ছলে কেলি করে, অহমহম্ অভিমানে।
কারণ বিম্ব হইতে, অব্যাহত কর্ম্ম স্রোতে,

বিভূতি বিকাশ হ'য়ে খেলা করে সঙ্গোপনে।
অকর্ম্মে সুকর্ম্মভাব, ভুলিয়ে নিজ স্বভাব,
ভাবলীলাতে মানব, ক্ষিতিহীন বিমানে।
বিহীন অবলম্বন, করিছে সদা ভ্রমণ,
মায়ার আঁচলে ঢাকা, স্বার্থময় অজ্ঞানে।
জ্ঞান বলে হ'য়ে বোধ, হইলে জীবত্ব রোধ –
দেখিবে শিবত্বভাব, নিত্য সত্য এ জীবনে। **১৪৮** ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল ঝাঁপতাল।

নবঘন নিবিড় কাল, সিতশ্যামল, কর্পূর ধবল জগজনমনোহারী।
অসিখর্পর, মুরলী ধর, ত্রিশূল পিণাকধারী ॥
লম্বিত চিকুর, শিখি–পাখা-চূড়, জটাজুট মণ্ডিত শির।
রুধির সিকত, চন্দন চর্চ্চিত, ভস্ম বিলেপিত ত্রিপুরারী।
দিগ্‌বসন, পীতবসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান।
শ্মশানে নিবাস, বৃন্দাবনে বাস, কাশী কৈলাস বিহারী ॥
নয়ন উৎপল, চমকিত চপল, নেশা বিহ্বল ঢল ঢল।
অসুর নিধন, গোপিকারমন, কন্দর্প দমনকারী ॥
ডাকিনী যোগিনী, গোপ গোপিনী, বেতাল ভৈরব সংহতি।
মুণ্ডমালা গলে, বনমালা দোলে, ভুজঙ্গ রুদ্রাক্ষ বেড়ী ॥
জবাচরণে, তুলসীনলিনে, ধুস্তর বিল্বদল সনে।
নমঃ কালীকায়, নমঃ কেশবায়, নমঃ শিবায় সন্তাপহারী ॥
কালীকৃষ্ণ শিবযোগে ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মানন্দ হৃদ্‌বিহারী।
সত্য সুধাসিন্ধু, প্রেমপূর্ণ ইন্দু, দয়া দীনবন্ধু মনো তোমারি। **১৪৯** ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার – তাল ধামাল।

একীভূত লীলার আঁধার শিবভক্তি মাধব।
জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যুক্ত ত্রিবেণী, পরশে মুক্ত মানব ॥
পূর্ণপরাৎপর ব্যাপ্ত চরাচর, বিশ্বম্ভর বিভূতি বিশ্ব বিভব ॥
উথলি কারণবারি, ছুটিল দিগন্ত ভরি,
মধুর মধু-মাধুরী, অমৃত নাম সম্ভব।
ত্রিতাপ তাপিত কায়, কত বা ডুবিল তায়,
আর কত ভেসে যায়, পাইতে তার সৌরভ।
চমৎকার ভাব মনে, লাগিল ক্ষিতি বিমানে,
নিয়ত নিদিধ্যাসনে, আইল সামীপ্যভাব। ১৫০ ॥

রাগিণী বসন্ত –তাল ঝাঁপতাল।

এ বিশ্বে সর্ব্বস্ব ধন তোমার দয়াল নাম।
অবিশ্রান্ত কর্ম্মধামে ক্ষণিক তরে বিশ্রাম।
জীবযুদ্ধে যুঝে জীব,
পরিণামে ভুলে শিব,
ত্রিতাপ দগ্ধ হৃদয়ে নহে পূর্ণ মনস্কাম।
করিতে আশা পূরণ
বিবিধ কত যতন,
বিমুখ রতন লাভে সুখভোগ আছে বাম।
দরিদ্র ভকত চিত,
কি পাইয়া উল্লাসিত,
আর কিছু নয় তার, পূর্ণ সুধাকর নাম। ১৫১ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল ঠুংরি।

প্রভাতে অঞ্জলি পূরি, ভকতি কুসুমরাজি তুলি –
প্রীতি চন্দনে রঞ্জিয়া, আনন্দময় চরণে দেহ ঢালি।
বিনয়াবনত শিরে, আনন্দে বদন ভরে,
গাওরে দয়াল নাম, সকল যাতনা ভুলি।
মানবীকরনে আজি, সাজা'য়ে শ্রীপদ রাজি,
আলো কর মন্দিরে, বিশ্বাস প্রদীপ জ্বালি।
প্রার্থনা প্রাণেরি কথা, মন্ত্র মরমেরি গাঁথা,
আচরণ উপকরণ, ভরিয়া হৃদয় থালি।
পূঁজিয়ে প্রাণনাথে, কৃতাঞ্জলি সম্মুখেতে,
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দেহ, আত্মসম্প্রদান ডালি। ১৫২ ॥

রাগিণী হাম্বীর – তাল ঝাঁপতাল।

বিশ্বপতি বিশ্ব বন্দন, হরি বিশ্বহিতকারী।
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর,এ বিশ্ব সৃষ্টি তোমারি।
বিশ্বাসে এ বিশ্বভাব, দেখে বিশ্বাসী মানব,
তোমারই বিশ্বরূপ, অতি বিস্ময়ে নেহারি।
বিশ্বের আদি দৃশ্য তুমি, তোমারি শিষ্য আমি,
হে করুণাময় স্বামী, কর দয়া নিস্বহেরে। ১৫৩ ॥

রাগিণী আড়ানা – তাল কনক।

সত্যমেব দমন, নানৃতম্।
চির সুখে রবে ভবে, লভিবে প্রেমামৃতম্।
সত্যমেব জয়তে, সত্যং সর্ব্ব পূঁজয়তে,
সত্যাশ্রয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম, সত্যম্ হি সর্ব্ব সাধনম্। ১৫৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল খেম্‌টা।

কোথায় পাব এত ভক্তি, এত প্রেম কোথায় পাব !
যত টুকু হলে তোমার, শ্রীপাদপদ্ম হবে লাভ।
যেতে অল্প সময় অনেক দূরে, একমাল্লা এক ডিঙ্গি চ'ড়ে,
যত কাম হাওয়ার জোরে, তত নৈলে কেমনে যাব।
আগে নৈলে তোমার দয়া, ঘুচে কি আর কায়ার মায়া,
যায় কি কভু আমির ছায়া, না পেলে তব স্বভাব।
এ'সময়ে এত দূর, যে'তে লাগবে যত জোর,
এত শক্তি নাহি মোর, ভেবে মরি কি করিব।
সতত চঞ্চল চিত্ত, অহংমদে হ'য়ে মত্ত,
না ভাবিয়ে পরমার্থ, ভাবি সে শুধু অভাব।
কৃপাহি ভরসা করি, মনোমোহনের ভাঙ্গা তরী,
অকূলেতে ধর্‌ছি পারি, বুঝতে নারি লাভালাভ। ১৫৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঝাঁপতাল।

আমি কি তোমার ভজন জানি।
অভজনে আছ কি না, ভেবে মরি দিন রজনী।
ভজনে ভজন ছাড়া, অভাজনে দয়া করা,
আছে নি তোর আইনের ধারা, সুধারা কর আপনি।
কি বিধি তোমার বিধি, ভেবে পাই না নিরবধি,
বেদবেদান্ত পুরাণাদি, যার যার ভাবে করে মাইনি।
কর্ম্মাকর্ম্ম নাহি জ্ঞান, অকর্ম্মে কর্ম্ম বিধান,
কর হে করুণা নিদান, করুণাময় নাম শুনি।
তুমি নিত্য সত্য সৎ, দেখাইয়ে রাজপথ,

সারথি হইয়ে রথ, চালাও নৈলে পাগল বনি।
চরণে দাসত্বখৎ লিখে দিনু জন্মের মত।
ক'রে লওনা দস্তখৎ, ক'রো না বিপথগামী।
প্রলোভনে মুগ্ধ মন, ঘুরে বেড়ায় অনুক্ষণ,
কি করে মনোমোহন, যা করে তা অনুমানি। ১৫৬ ॥

রাগিণী লুম্‌ খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

তোমার কাছে যেতে প্রভু, দাও আমারে পথ করে।
চলিতে পারি না আর, কণ্টক রয়েছে ঘিরে।
কাম ক্রোধ লোভ আদি, ঘৃণা লজ্জা ভয় ইত্যাদি,
অন্নচিন্তা নিরবধি, হল বাদি একেবারে।
মহা বলবান বায়ু, নাশিতেছে বল আয়ু,
প্রকোপিত পিত্তাধার, জ্বলিছে সদা অন্তরে।
পান করি হলাহল, হয়েছি অতি দুর্ব্বল,
করহে অন্তঃশীতল, সবল দীনহীনেরে।
দেহ রাজ্যে দিয়ে শান্তি, ঘুচাও মনের ভ্রান্তি,
প্রভুহে ! বিমল কান্তি, প্রকাশ হৃদি মাঝারে। ১৫৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঝাঁপ্‌তাল।

আমার হৃদয় ছেড়ে আর কোথাও যেও নাহে দয়াল হরি।
হৃদে থাক, হৃদে জাগ, হৃদে মাখ – প্রেম তোমারি।
হৃদয়ের দেবতা তুমি, অনুগত সেবক আমি,
শিখা'য়ে দেও সেবাব্রত, শ্রীপদে মিনতি করি।
ব'সে আছি হাল ছাড়িয়ে, অকূলে তরী ভাসায়ে,
মনের মতন সাধন দিয়ে, মনমোহনের মন লও কাড়ি। ১৫৮ ॥

রাগিণী সাহেনামিশ্র – তাল যৎ।

যা আছে আমার বলে কান্দাইয়া লও কেড়ে।
আর যে কখন এদিক্ ওদিক্, না করি তোমারে ছেড়ে।
একচ্ছত্র অধিকারে, প্রজা আমি তব দ্বারে,
গ্রহণ কর তুমি মোরে, নিশ্চিন্ত থাকি সংসারে।
কি ভাবে হয় প্রাণ সমর্পণ, জানেনা তা মনোমোহন,
জানাইয়ে যুগল চরণ, উঠাইয়া দাও তার শিরে। ১৫৯ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল কাওয়ালী।

ওহে আমার দয়াল হরি –
আমায় এমনি করে জড়ায়ে ধর, আর যে কভু ছুটিতে নারি।
এদিক ওদিক সেদিক করে, আর ঘুর্‌তে দিও না মোরে,
সূত্র আছে তোমার করে, গুটিয়ে ধর কৃপা করি।
মায়াকান্না পাক বাতাসে, জ্ঞানমোণ্ডা পড়্ছে খসে,
কি করি তাই ভাবছি বসে, বিনে তোমার কৃপাতরী।
এ তরঙ্গে দিতে পারি, সতত আশঙ্কা করি,
দিক ঠিকানা হয় না তারি, সবদিকে ঘুরিয়ে ফিরি।
সবদিক একদিক করে, তোমার দিকে টান জোরে,
আর যে কখন ঘুরে ফিরে, যাতনাতে নাহি মরি। ১৬০ ॥

রাগিণী ললিত বিভাস – তাল একতালা।

প্রভু আমার এই মিনতি, দিনরাতি অভয় পদে।
আমার সবখানা মন কুড়িয়ে এনে, তোমার কাছে দাও হে
দিতে।
যদি রাখি মন কোথা লুকাইয়ে,

কেড়ে লও আমায় কান্দায়ে কান্দায়ে,
তোমার যাতে ভাল, হউক আমার মন্দ, ভালমন্দ আমি
চাই না জানিতে,
আজন্ম ভরিয়া আমার ভাল করে
করতে নারলাম কিছু দেখলাম কত ঘুরে,
এই আমি সর্ব্বস্ব সকল একযোগ করে সঁপে দিনু তোমার পদে।
দয়া করে নাথ দীনহীন কাঙ্গালে,
টেনে লও তুমি আনন্দময় কোলে,
মনোমোহন তোমার অজ্ঞান অবোধ ছেলে, তা বলে কখনও
নিও না কুপথে। ১৬১ ॥

রাগিণী গোরী পূরবি – তাল ঠুংরী।

দুর্ব্বল হৃদয় দিয়া কেমনে ডাকিব তোরে।
তবে যদি শুনতে পার, না থাকিলে বেশী দূরে।
থাকলে পরে প্রাণ জড়া'য়ে, ডাকলে পরে প্রাণ ভরিয়ে,
শুন যদি শুনতে পার ক্ষীণ কণ্ঠের ভাঙ্গা স্বরে।
হৃদয় আড়ালে বসি, থাক যদি প্রাণশশী,
তবে হয়ত শুনতে পাবে করাঘাত হৃদিদ্বারে।
নীরব সে ডাক শুনিয়ে, দাও যদি হে দ্বার খুলিয়ে,
তবে হয়ত দেখতে পাব, থাকতে পাব চরণ ধরে। ১৬২ ॥

রাগিণী পূরবী – তাল আড়াঠেকা।

বহুরূপ ধরেছ বলে, স্বরূপ তোমার চিনতে নারি।
স্বরূপ তোমার কিরূপ আকার, চিনায়ে দাও দয়াল হরি।
অন্ধ আমি হাতে ধরে, পথ দেখাইয়ে দাও আমারে,

ভজনের বল দাও অন্তরে, ডাকিতে যেমন পারি।
কি ভাবেতে ডাকলে পরে, দীনহীন কাঙ্গালের ঘরে,
আসতে পার দয়া করে, সে ভাব শিখাও কৃপা করি।
হরি তোমার কাছ যেতে, যারা বাঁধা দেয় সে পথে
রক্ষা কর তাদের হাতে, যুগল চরণে ধরি।
আমারে কর তোমার, চাহি না যে কিছু আর,
শ্রীচরণে দিয়ে ভার, ভবসিন্ধু দেই পারি।
সহজে সরল প্রাণে, ব'সে থাকি তব ধ্যানে,
দয়া কর দীনহীনে দয়াময় নাম তোমারি। ১৬৩ ॥

রাগিণী পরজবাহার – তাল ঝাঁপতাল।

খুলে দাও শান্তির দুয়ার।
কাছে বসে থাক তুমি সর্ব্বদা আমার।
করাঘাতে হাতে বেদনা প্রচুর, ডে'কে ডে'কে বুকে বে'জে–
গেছে সুর,
নিশি ভোর ভোর হ্যারে চিত্তচোর, বড়ই কঠোর অন্তর তোমার।
সুখে শয্যামাঝে, শুয়ে আছ তুমি, অন্ধকারে দ্বারে ভ্রমিতেছি
আমি,
আশা দিয়ে টেনে দ্বারের কাছে এ'নে, দুর্ব্বলের সনে এ কি
ব্যবহার।
ধরা দিবে বলে, প্রাণে দিয়ে আশা, ঘর ছাড়াইয়া চুপি চুপি হাসা,
হায়রে ভালবাসা, কুলধর্ম্মনাশা, গাছতলা বাসা করিলি এবার।
তবু যদি দয়া হইত তোমার, খুলে দিতে তুমি চিররুদ্ধ দ্বার,
জনমের ধার, জীবনের ভার, ভুলে যে'ত মনো বিপত্তি অপার। ১৬৪ ॥

রাগিণী আলাইয়া – তাল একতালা।

দয়াময় ! স্বভাবে দাওহে আশ্রয়।
অভাবেতে কত রব ভবজ্বালা নাহি সয়।
আমি করি তুমি কর, তোমাতে এই নির্ভর,
করিতে নারে অন্তর, তাহে করি ভয়।
বিশ্বে তব এক ছবি, আঁধারে উজল রবি,
ছায়া কায়া আমিত্বতা, পূর্ণ জ্ঞানে কর লয়। ১৬৫ ॥

রাগিণী দেবগিরি– তাল আড়াঠেকা।

এসেছে পথিক, অতিথির মত তব দ্বারে।
হয়ে পথহারা, না পেয়ে কিনারা, নিরাশ্রয় হয়ে ফিরে।
পথ ভুলে গিয়ে, ঘাটে মাঠে ঘুরে, কণ্টক আঘাত শীর্ণ কলেবরে,
জীর্ণ বস্ত্র পরে, মলিন অন্তরে, সারাদিন অনাহারে।
যার কাছে যাই, বলে সর্ সর্, কাঙ্গাল বলে কেউ করেনা
আদর,
তারা আমায় ঠেলে, দিতে চায় ফেলে, টেনে তুলে লও ঘরে।
তোমার কাছে নাকি নাই আপন পর, তাই সাহস পেয়ে
হলেম অগ্রসর।
ডাকি বাবা বলে, দাও দ্বার খুলে, অন্ধ আমি অন্ধকারে।
ফিরে যাব বলে আসি নাই হেথা, দ্বারে রব পড়ে যাব না কোথা,
সর্ সর্ করে ঠেলে দিলে পরে, সরে নাহি যাব দূরে।
যায় যাবে প্রাণ থাক তব দ্বারে, রোগে শোকে ক্লিষ্ট শীর্ণ
অনাহারে,
না কর জিজ্ঞাসা, আকুল পিয়াসা থাকে যেন সদা অন্তরে। ১৬৬ ॥

রাগিণী মনোহর সাই – তাল একতালা।

অনন্ত পাথারে, ভাসায়ে আমারে, নিতেছে না জানি
কে কোথায়।
তরঙ্গে তরঙ্গে, উজান ভাটী রঙ্গে, সঙ্গে নাহি দেখি তায়।
কোথা হতে আসি ভাসি লাগে ঢেউ, পর পারে তার আছে
নাকি কেউ,
নৈলে এমন করে হৃদয় ভিতরে, হাসায়ে হাসায়ে কান্দায়ে যায়।
দূরে দূরে দূরে কত দূরে থাকি, থেকে থেকে মাঝে মাঝে
মারে উঁকি,
চঞ্চল আঁখিঠারে, নিমিষে আমারে, ভুলায়ে দূরে, অমনি
লুকায়।
বারে বারে তাঁরে, ফিরে ফিরে চাই, ধীরে ধীরে সরে পাছে
পাছে ধাই,
ধরা দিবে বলে, দেই প্রাণ খুলে, ডাকি বাহু তুলে, আয়
আয়, আয়।
কাছে আছি বলে, কি জানি কি পেয়ে, মেতে উঠে প্রাণ
কখন হাসি দিয়ে
কারে ভালবাসে, কেন কান্দে হাসে, কোথায় আছে সে
আমি বা কোথায়।
নাহি তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়, তবু তাঁর লাগি উদাসী হৃদয়,
সে আমারে চায়, আমার প্রাণ তাঁয়, কোথা যেতে জানি
তরঙ্গ খেলায়।
পাব বলে তাঁরে আশা করে করে, ভেসে দেশে দেশে
অনন্ত পাথারে,
চলছে মনো ধেয়ে, পাবে কোথা গিয়ে, টান্ দিলে নাকি প্রাণে,
পাওয়া যায়। ১৬৭ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

তুমি কাছে ডে'কে নিলে, আমি কি আর দূরে যাই।
তোমারে পাইলে তবে, আর কিছু কি পেতে চাই।
খেলার ঘরে পেতে খেলা, খে'ল দিতেছ সারা বেলা,
কখন জিতি কখন হারি, কি করি বুঝি না তাই।
হাসি কান্দি নাচি গাই, ঘুরা'লে ঘু'রে বেড়াই,
পেট ভরে দু বেলা খেয়ে, কখন শু'য়ে নিদ্রা যাই।
কখন বাঁধি বাড়ী ঘর, কখন ভাবি আপন পর,
কখন বা করি নির্ভর, অকূল যখন দেখতে পাই।
কখন কখন স্বপন দেখি, তুমি আমি মাখামাখি,
কখন বা ঝরে দু আঁখি, কি জানি কি পেতে চাই !
কখন বা কার আশায় থাকি, চঞ্চল হয় প্রাণপাখী,
আবার যেন কি ভেবে কি, লুকি দিয়ে থাকে তাই।
জন্ম-মরণ আগে পাছে, খেলোয়ারে খে'ল দিতেছে,
মনোমোহনের মন ছুটেছে, খে'ল ভেঙ্গে কুল পেতে চাই। ১৬৮ ॥

রাগিণী আলাইয়া – তাল ঝাঁপতাল।

আরজি করলেম গুরু, তোমার রাজদরবারে।
আমি জন্ম মিয়াদী, অপরাধী, দাও আমারে খালাস করে।
রক্ষক বলিয়া মনে করি যারে, তক্ষক হইয়া দংশে মম শিরে,
যে যেমন পারে জেলখানাতে মারে, কাতরে ডাকি তোমারে।
যদি কভু চাই কারো মুখ পানে, ঘুরে রাঙ্গা আঁখি ভ্রুকুটি বদনে,
দেখি ভীত হয়ে আকুল হৃদয়ে, মরিতে বাসনা করে।
ফসল রাখিতে দিলাম শক্ত বেড়া, বেড়ায় খাইল শস্য করে দফাসারা,
হলেম আত্মহারা, না দেখি কিনারা, ঘেরিয়াছে অন্ধকারে।

পুষ্পমালা আমি পরিলাম গলে, ফণী হয়ে চায় দংশিবারে ছলে,
সুধাকর করে, বিষ বৃষ্টি করে, কত রব কারাগারে।
রাজরাজ্যেশ্বর তুমি দয়াময়, কাঙ্গাল বলে যদি ঘৃণা নাহি হয়,
অবরোধ মুক্ত করে এসময় পরোয়ানা লিখ সত্বরে। **১৬৯** ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ – তাল একতালা।

বাহিয়ে তরণী সকাল বেলা –
তোমার কাছে যেতে, অনুকূল হাওয়াতে, স্রোতে করেছিনু মেলা।
ঘোর ঘূর্ণিপাকে, পরিয়ে পথে, পথ ভুলে গিয়ে আঁধার রেতে,
দূরে গেছি সরে, প্রহারে প্রহারে, জীর্ণ শীর্ণ ভেলা।
অকূল পাথারে না দেখি কিনার, দৃষ্টি নাহি চলে ঘোর অন্ধকার,
উলটী পালটি সাপটি তরঙ্গ, করিতেছে রঙ্গ খেলা।
হাঙ্গর কুম্ভীর হিংস্র জন্তুগণে, ধেয়ে তারা আসে ধে'য়ে আমার পানে,
কোথায় যাব বলে কোথায় যাচ্ছি চলে, অকূলে আমি একলা।
উজান ভাটি ঢেউয়ে খেলিয়ে তরী, কোথায় জানি যায় বুঝিতে নারি,
হে ভবকাণ্ডারি, দীনহীন তোমারি, ভাবিয়ে অতি উতালা।
দেউটি জ্বালিয়ে তুমি দয়া করি, এসময় হরি লও তালাস করি,
তোমার মেষপাল তুমিহে রাখাল, হ'লে পরে সন্ধ্যাবেলা–
কে কোথায় ছুটিয়ে গিয়াছে দূরে, নিতে হবে তোমার অন্বেষণ করে,
তাই আছি পড়ে, তোমার নাম ধরে, ভুল না এ পথভুলা। **১৭০** ॥

রাগিণী মল্লার – তাল একতালা।

দয়াময় ! কে জানে তব কৌশলে।
আদর অনাদর কর, কারে কোন ছলে।
আদরে প্রেম সম্ভোগ, অনাদরে বিষযোগ,
বিষামৃত যোগে তুমি, খেলা কর কুতুহলে।
বিহিত তোমার বিধি, অবহিত নয় অবিধি,
ভাল মন্দ সবই বিধি, নিরবধি হৃদিমূলে।
কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, তুমি সকলেরই মর্ম্ম ,
জ্ঞানদাতা পরব্রহ্ম, জন্ম দুঃখ অবহেলে।
দয়াতে কর বিনাশ, না হয় যেন বৃদ্ধিহ্রাস,
কেটে দিয়ে অষ্ট পাশ, সন্তানেরে কর কোলে।
তুমি যে তোমাতে গড়া, ডুবাইয়ে দুই নয়ন তারা,
দেখুক আঁখি জন্ম ভরা, জরা মৃত্যু পায় ঠেলে!
তোমারি করুণাগুনে, সকলই সম্ভব প্রাণে,
দীনহীন মনোমোহনে, স্থান দাও চরণতলে। **১৭১** ॥

রাগিণী সারঙ্গ – তাল যৎ।

কঠোর মধুর সদয় নিদয়, তোমারি লীলা কৌশল।
কে জানে নিগূঢ় মর্ম্ম, তুমি ময় এই ভূমণ্ডল।
কাম ক্রোধ মোহ লোভ, সকলি তোমারি ভাব,
ভাবে ভাবে দিছে ভাব, স্বভাব সত্য কমল।
লীলাতে হেরিয়ে রঙ্গ, সকলি তব ভ্রুভঙ্গ,

জগন্ময়ী তোমর অঙ্গ, কেবলং সত্বা কেবল।
ত্রিগুণে ধরিয়া ছায়া, খেলিতেছে যত মায়া,
অরূপে নাই রূপের কায়া, দয়াময় নাম সম্বল।
শক্তিচৈত্য পিতামাতা, দিতেছ স্বভাবের বার্ত্তা।
নিয়ম রাজ্যে দিছে বাঁধা, বিলাসে হৃদি চঞ্চল।
বিলাস বৈরাগ্য মাঝে, সমভাবে সে বিরাজে
লাজ ভাঙ্গিয়ে মরি লাজে, লীলাতে নিত্য বিভোলা। ১৭২ ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার – তাল ঝাঁপতাল।

মিত্রামিত্র যোগে তব, সাধনা অতি সুন্দর।
আনন্দে বিভোর করে, সর্ব্বদা জীব অন্তর।
বরাভয় যুগ্মকর, খরশান অসি ধর,
বিষামৃত যোগে তুমি, তুমি পূর্ণ সুধাকর।
সংযোগে বিয়োগে নীতি, খেলিছে বিমান ক্ষিতি,
অভাবে স্বভাবে গতি, লীলা নিত্য মনোহর।
বিহনে কভু সংগ্রাম, মিলে না পূর্ণ আরাম,
চঞ্চল হৃদয় কাম, হয় না কভূ স্থিরতর।
কামে প্রেমে খেলা পেতে, আকর্ষিছে সদা ঊর্দ্ধে,
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, পরম কল্যাণ কর।
বিশ্বে তব এক কায়া, বিভূতি নানা মায়া,
আমিত্বতা মায়াছায়া, কৃপাতে হরণ কর। ১৭৩ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল কাওয়ালী।

আদরেতে ভালবাসা, সঙ্গে লয়ে সঙ্গিনী,
প্রতিকূলে প্রীতি মাখা, পুলকে দিন যামিনী।
প্রেমে শান্ত দাস্য সখ্য, বাৎসল্য মধুরে লক্ষ্য,
স্থির কর হবে পক্ষ, সেই মোক্ষ প্রেমদায়িনী।
পবন পাবক জল, বিমান ক্ষিতি সকল,
মিলিয়ে এক কমল, পরিমল পরশমণি।
পরশ সরস তার, হবে সে যদি অমর,
হরষে সেবন কর, সে রসে সুধা বাখানি। ১৭৪ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল কাওয়ালী।

সাধরে স্বয়ম্ভু যোগ, গোপনে অতি যতনে।
বহিঃ শিব হৃদে শক্তি, শ্রীহরি বল বদনে।
সারূপ্য সাধনে আন, অতীন্দ্রিয়রূপ ধ্যান,
অনিমেষ চোখে দেখ, কৈবল্য কেবলং ধনে।
প্রকৃতি পুরুষ সনে, দেখ তারে একাসনে,
সাযুজ্য সাধনে আছে, ছদ্মবেশে এ ভুবনে।
সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, বুঝিয়ে সাধরে মর্ম্ম ,
অন্তর বাহির এক, মোহং শিব সাধনে।
আলোকে আঁধারে জোড়া, নাহি তার আগাগোড়া,
ভাবরে চিন্ময় ছবি, নিয়ত নিদিধ্যাসনে। ১৭৫ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল যৎ।

মন ভাব তোমারে আপন স্বভাবে।
অবলম্বন জগতে, তুমি মাত্র সর্বে।
চায় না আর কোন দিকে, প্রাণ চক্ষু অনিমিষে,

সেরূপ মাধুরী পানে, চেয়ে রহে গরবে।
ছদ্মবেশী শিশু সবে, সম্মুখীন হল এবে,
প্রকাশ পূর্ণ প্রতিভা হৃদয় চাহে যে ভাবে। ১৭৬ ॥

রাগিণী বাউল সঙ্গীত – তাল একতালা।

সকলের কি জাগে, যার জাগে, তার জাগে।
দু'চার জনার জাগে, যার ভাগ্যে থাকে জাগে।
মনচোরা শ্যামের বেশে, তার কাছে সে দাঁড়ায় এসে,
যে তাহারে ভালবাসে, সরল প্রাণে তারে ডাকে।
গাভী যেমন বৎসের তাকে, ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে,
তৃণমুখে হুঁ হুঁ ডাকে, সে কি তারে ছেড়ে থাকে।
ভোগী ভোগে, রোগী রোগে, ভুলে থাকে আপনাকে,
অনুরাগীর অনুরাগে, যোগীজনার হৃদে জাগে।
ডাক্‌তে জানলে ডাকে জাগে, ভাব্‌তে জানলে ভাবে জাগে,
জ্ঞানীজনার জ্ঞানে জাগে, ভক্তের যদি ভক্তি থাকে।
জাগাইতে জান্‌লে জাগে, কারোও বা জাগায়ে জাগে,
কারো পাছে কারো আগে, যার যেমন ভাগ্যে থাকে।
যে যা ভাবে, তার তাই জাগে, অনুরাগীর চিত্তে জাগে,
নিত্যধন অনুরাগে, জাগরণ তার যার যার যোগে।
আপনা হতে কখন জাগে, যখনে তার সময় লাগে,
মনোমোহন কয় আগে জাগে, ডেকে জাগায় সে আমাকে। ১৭৭ ॥

রাগিণী অসোয়ারী – তাল ঝাঁপতাল।

অনেক দিন হয় পথ দিয়াছি, যাব বলে তোমার কাছে।
যেতে যেতে দিন্ ত গেল, আর কত দূর বাকী আছে।
দেখি দেখি পাই পাই, এই যেন এই নাই নাই,

চৌদিকে ফিরিয়া চাই, অন্ধকারে ধান্দা দিছে।
না পাইয়ে তার দিকের নির্ণয়, বেহুস্ থাকি কতক সময়,
আবার ছুটী যে দিক মন লয়, দাঁড়াই আবার মাঝে মাঝে।
কখন বা ভয় কখন বিস্ময়, কখন কিছু আশাও হয়।
কখন হয়ে দুর্ব্বল হৃদয়, কতই বলি মিছে মিছে।
কখন দেখি পথের ধারে, কণ্টকে রয়েছে ঘিরে,
কখন দেখি সাগর পাহাড়, কে করে পার আশা মিছে।
কখন বা অকূলে পড়ে, প্রাণ হাবুডুবু করে,
কখন দেখি উঠে তীরে, ধীরে ধীরে চল্‌ছি পাছে।
কোথায় তুমি কতদূরে, যেতে হয় কোন্ পথ ধরে,
সহজ পথে দয়া করে, অধমসুতে নেওনা কাছে। ১৭৮ ॥

রাগিণী ভূপালী – তাল কাওয়ালী।

আমার আমিত্ব লয়ে, ধেয়ে চলিয়াছি ভেসে।
কে জানে কোথায় যাই, না যানি যাব কোন্ দেশে।
অনন্তে অনন্ত গতি, কোথা গেলে পাব স্থিতি,
কুমতি দুর্ম্মতি অতি, দীনহীন কাঙ্গালের বেশে –
তরঙ্গে তরঙ্গে আমি, সঙ্গে রঙ্গে আমি তুমি,
মিলিয়া অনন্তে আমি, খেলিয়া সে তুমি শেষে।
উর্ম্মিময় অতল জলে, আমিত্ব খেলি কৌশলে,
স্মৃতিহীন অতল তলে, সদলে কৌতুকে মিলে।
অনন্তের নাহি পার, অনন্তে গতি আমার,
অন্তহীন সে পারাবার, পার হইব কোন্ সাহসে।
অনন্ত স্রোতেরি টান, টান দিতেছে মহাপ্রাণ,
মনোমোহন কয় আত্মদান, করিলে তার পাবি দিশে। ১৭৯ ॥

রাগিণী আলাইয়া – তাল তেতালা।

তোরা পারি দিতে তরী নিয়ে, ভাস্‌গে যা অকুল পাথারে।
আমি যাব না সে অকুল জলে, ধীরে যাব পারে পারে।
অকূল নদী পারি দিতে, কি সাধ্য কার হয় জগতে,
আপন বুঝে আপ্‌না হতে, তাই আমি উঠেছি পারে।
এ পার সে পার নাই কোন পার, না আছে কুল নাইত কিনার,
মনোমোহন কয় ও মন আমার, হাইল ছাড়িয়ে বস ঘরে।
খর স্রোতে আছে টান, তাতে ছেড়ে দাও প্রাণ,
ধরা দিবে মহাপ্রাণ, রাখিও প্রাণ প্রাণের ধারে।
প্রাণের সাগর প্রেমের খেলা, প্রেম নিয়ে প্রাণ হয় উতালা,
কাজ কিরে তায় মাঝিমাল্লা, প্রাণ কয় প্রাণ হরে হরে। **১৮০** ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল যৎ।

যা কর তা কর প্রভু, আমি তোমায় না ছাড়িব।
তোমার পায় আর আমার গলায়, রসি বেঁধে ফাঁসি দিব।
যত চাবে তুমি দূরে সরাইতে, তত চাব আমি জড়ায়ে ধরিতে,
করে জোরাজোরি আকুল হয়ে হরি, কোল কাড়ি নিব।
যদি ঠেলা দাও ব্রহ্মাণ্ডের জোরে, আমি ঠেলে যাব তোমার
নামই ধরে,
লাগবে ঝুকাঝুকি, খেলবে প্রাণপাখী, আঁখি বরষিব।
তোমার হাতে পড়ে এ সম্মুখ রণে, যায় যদি প্রান
কি আনন্দ মনে,
সঙ্কল্প প্রাণেতে, তোমায় প্রাণ দিতে, দূরে না সরিব।
কেন্দে কেন্দে প্রাণ দেই আমি তোমায়, হাসি দিয়ে কেন
ফিরে দাও তায়,
মনোমোহন তোমায় কেবল দিতে চায়, ফিরে না লইব। **১৮১** ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল একতাল।

রাখাল তোমার গোপাল হতে, একটী বৎস হারিয়ে গেলে।
তালাস করে তুমি তারে, না নিয়ে কি যাবে ফেলে।
স্বভাব দোষে নাচ্‌তে যেয়ে, শিশু বৎস ধেয়ে ধেয়ে,
গেলে পরে পাল ছাড়িয়ে, গহন বনে পথ ভুলে।
রাখাল তুমি সকল ছেড়ে, ব্যাকুল হয়ে ঘুরে ফিরে,
দেখ্‌তে পাই আন্‌তে তারে, আদর করে নিয়ে কোলে।
কাছ থেকে মা গেলে দূরে, শিশু বৎস হাম্বা করে,
ডাক্‌লে ত মা আসে দৌড়ে, উচ্চ পুচ্ছ লেজ তুলে।
আমি তোমার হারিয়ে গেছি, দূরে সরে পড়ে আছি,
হাম্বা করে ডাক দিতেছি, তুমি আমার কই রইলে।
গহন বনে এক্‌লা পড়ে, নেও আমারে তালাস করে,
মনো কয় রাখাল ভাইরে, দোষ হবে তোর না নিলে। **১৮২** ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল খেম্‌টা।

কইব কি তাঁর প্রেমের কথা কইতে না যুয়ায়।
অমূল্য ধন, গুরুর চরণ, কাঙ্গালে লয়ে খেলায়।
রাজা বাদ্‌শা পায় না তারে, সামান্য ধনের বিকারে,
কাঙ্গাল সে ধন তুচ্ছ ক'রে, সদানন্দে দিন কাটায়।
পাইতে শুধু আনন্দ, জগৎ ভরে এত দ্বন্দ,
দীনের কাছে সে ধন বন্ধ, পায় না তারে দালান কোঠায়।
মণি মুক্তা যতই বল, শান্তি বিনা সব বিফল,
সব ছেড়ে দে'হরি বল, শান্তি ফল পাবে তায়।
কুড়ে ঘর কি গাছের তলা, বাসা করে রও নিরালা,
একলা মনে নামের মালা, জপ যে'য়ে সর্ব্বদায়।

যে ধন না পায় জগৎ মূল্যে, সে ধন পাবে অবহেলে,
কয় মনোমোহন দীন কাঙ্গালে, এম্‌নি ভাবে দিন যেন যায়। **১৮৩ ॥**

রাগিণী ফকিরিসুর – তাল একতালা।

সে ধন সহজে কি ঘটে।
যার ভাগ্যে আছে, পায় সে কাছে, নৈলে ফিরে মাঠে মাঠে।
গুরু সত্যরূপে আছেন সত্য, প্রতি ঘটে ঘটে,
সত্য মিথ্যা যোগ করে তাই, কেবল আপদ ঘটে।
কুল ছেড়ে কেউ কুল পাইতে, নামে নদীর ঘাটে,
ঢেউ দেখিয়ে চুব্‌ড়ি খেয়ে, ফিরে আবার তটে।
কুম্ভকারে আগুন দিলে, কত পাতিল ফাটে,
কর্ম্মদোষে ভয় পাইয়ে, আপদ কত ঘটে।
ফল পাড়িতে কেহ কেহ, কখন গাছে উঠে,
হুহুঙ্কারে নীচে পড়ে, অমনি আবার হটে।
বাঁধা বাছুর দৈববশে যদি, দড়ি ছিড়ে ছুটে,
মুখ লাগয়ে চুষে যেমন, শক্ত করে গাভীর বাটে।
মনোমোহন কয় কার যদি মন, এমন হয়ে থাকে বটে,
সে কখনও যায় না ফিরে, কাঁদলে হাসি আপনি ফুটে। **১৮৪ ॥**

রাগিণী পিলু – তাল আড়াখেম্‌টা।

শুন্‌রে সোণা শুনার শুনা, শুনা কথা একটি শুন্।
শুনাই তোরে শুনলে পরে, মুছে যাবে কালী চূণ।
শুন্‌ছি আমি আছে শুনা, পরশেতে হয়গো সোণা,
নৈলে কেবল থাক্‌লে শুনা, হয়না সোণা বলি শুন্।
সোণা ঘসা স্বভাব শীলে, মন সোণাকে দেখনা ড’লে,

সোণা তোমার সোণা হইলে, ধরবে তাতে সোণার গুণ।
ভেঙ্গে গেলে চাঁদের কোণা, শুনাতো হয় না সোণা,
সে কেবল শুণার শুনা, শুনে শুনে হলি খুন।
মনোমোহন কয় ওরে সোণা, যদি তোমার থাকে শুনা,
গালাইয়া লও কেলেসোণা, (দিয়ে) প্রেম সোহাগা
জ্ঞানাগুন। **১৮৫ ॥**

রাগিণী মল্লার – তাল একতালা।

পঞ্চে পঞ্চ যাবে যদি, না রবে বারণ।
পঞ্চত্ব না পেতে কর, পঞ্চকে বরণ।
পঞ্চভাবের স্বভাব ধরে, পঞ্চকে বঞ্চনা করে,
প্রপঞ্চ ছাড়িয়ে হও, মাটীর মতন।
বেদ ছাড়া বেদ পড়, বিধি ছাড়া বিধি ধর,
করণ ছাড়া কার্য্য কর, হবে না মরণ।
এক আত্মা একই প্রাণী, এক আগুণ একই পাণি।
এক বিনা আর নাহি জানি, যে বলুক যেমন।
স্বভাবেতে তত্ত্ব কথা, নিগূম ঘরে আছে গাঁথা,
স্বভাব নৈলে সকল বৃথা, সত্য নিরূপণ !
লাগাইয়া ভাবের ডুরি, স্বভাবের ভাব কর চুরি,
অনায়াসে যাবে তরি, কহিছে মনোমোহন। **১৮৬ ॥**

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাওয়ালী।

হৃদ্‌কদম্ব তরুপরে, –
বাসা করে মন বিহঙ্গ, ব্রহ্ম নাম গাওরে।
চিচিকি চিচিকি চাক্, চরণে মজিয়া থাক।

তনে মনে মিশায়ে বাক, অবাক হয়ে রওরে।
তৎসৎ ব্রহ্মরসে, পিয়রে পাখী হরষে,
চেয়ে থাক অনিমিষে, আবেশিত কলেবরে। ১৮৭ ॥

রাগিণী আলাইয়া – তাল একতালা।

তোমার মধূর নাম যে ধরে সদা অধরে –
দারিদ্র দুঃখ দহনে, বিপদে, তারে কি করিতে পারে।
সুখে দুঃখে সমভাবে, যে জন তোমারে ভাবে,
কি করে তারে অভাবে, স্বভাব হীন সংসারে।
শত দুঃখ উপেক্ষিত, যে তব চরণাশ্রিত,
না পারে দেখাতে ভয়, ভ্রুকুটি তার অন্তরে। ১৮৮ ॥

রাগিণী গুর্জ্জরী – তাল ঠুংরী।

বললো সজনি আমার সে কই, সে কই –
যাহার লাগিয়ে উদাসী হইয়ে, পাগলিনী সেজে রই।
প্রাণ যারে চায়, সে কই,
হৃদয় যারে গায়, সে কই,
বাঁশী যে বাজায়, সে কই,
হাসি যে খেলায়, সে কই,
পলকে ভুলায়, সে কই,
মন যে দোলায়, সে কই,
মাতিয়ে মাতায়, সে কই,
জাগিয়ে জাগায়, সে কই ?

যাহার লাগিয়ে পরাণ পুতলি, আপনা আপনি নাচিয়া উঠে,
ডুবাইয়ে তার, নয়ন ধারা, – অবিরল বেগে ছুটে।
যাহারে পাইলে সকল পাওয়া যায়, সেই কই,
যাহারে পাইলে সকল জানা যায়, সে কই,
যাহারে পাইলে সকলি ফুরায়, সে কই,
পরশিলে যারে জীবন জুড়ায়, সে কই,
হেলিয়ে দুলিয়ে পরাণে খেলায়, সে কই,
আপনি কাঁদিয়ে আমারে কাঁদায়, সে কই,
আপনি হাসিয়ে আমারে হাসায়, সে কই,
আপনি মাতিয়ে আমারে মাতায়, সে কই,
আপনার বলে আপনি জাগায়, সে কই,
যাহারে দেখিলে নয়ন জুড়ায়, সে কই,
মায়ের মতন মাখা মমতায়, সে কই,
ভাইয়ের মত স্নেহ করুণায়, সে কই,
সখার মতন এক সমতায়, সে কই,
পরশে যাহার সরস জীবন, সর্ব্বস্ব ধন মানুষ ঘটে,
উদাসিয়া থাকি, এ পাগল আঁখি, যেরূপ নিরখি চমকি উঠে।
যাহার লাগিয়ে পাগল পারা, সে কই –
যাহার লাগিয়ে আপনা হারা, সে কই –
যাহার লাগিয়ে নিভে না ধারা, সে কই –
যাহার লাগিয়ে জীয়ন্তে মরা, সে কই –
"যে জন" বলা যায় না তারে, সজনী ধরা কি অধরা – সে কই
হংস হংস করি, সে রূপ পাসরি, স্বরূপ ধরিয়া জাগে,
প্রিয় হইতে প্রিয়, পরম আত্মীয়, আপনার মত লাগে। ১৮৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী।

বললো সজনি, আমি কোথা পাব সে কারিগরে।
নিখুঁত করে ভাবের ছবি, যে জন এঁকে দিতে পারে।

(১)

ভাবের মানুষ কি ভাবে সে গড়া,
ভাব ধরে দে'খেছি তায়, না দেয় সে ধরা।
ধর্‌তে গেলে আপন হারা হইয়ে পড়ি ভাবের ভোরে ॥

(২)

ডুবাইয়ে দুই নয়ন তারা,
দেখিয়াছি ভাবের মানুষ, না যায় পাশরা।
সেত আপ্‌নি এসে ঢেউ খেলায়ে, ডুবাইয়া দেয় অতল নীরে ॥

(৩)

ভরা ভরা এক ভাবের চেহারা,
প্রাণ আমার নিয়াছে কেড়ে আপন হারা।
তারে ধর্‌তে গেলে না দেয় ধরা, ধরে দিবে কে আমারে।

(৪)

গড়তে গিয়ে ভাবমূরতি কয়বার ভেঙ্গেছি,
গড়া যায় না ধরা দেয় না বসে ভাব্‌তেছি।
যে গড়েছে জগৎখানা, কে গড়িয়া দিবে তারে ॥

(৫)

ভাবের পুতুল ত্রিবেণী উজান,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হয়ে, বাঁশীতে ধ'রেছে তান,
লীলা খেলা সব এক জনার, ত্রিগুণে ত্রিগুণা করে ॥

(৬)

ভাবের মানুষ গড়াত যায় না,
মনোমোহন তাই তারি মন ধরতে পায় না।
শুধু ভাবকান্তিতে আনাগোনা, লীলা নিত্য লীলা করে। **১৯০** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাহারবা।

প্রাণের কথা প্রাণই জানে, আর কারোরে জান্‌তে দেয় না।
জানাব কি জান্‌বে কি সে, প্রাণের মানুষ খুঁজে পায় না।
প্রাণেতে আছে প্রমাণ, ওজনে হয় ঠিক এক সমান,
দূরে যায় তার মান অভিমান, প্রাণের মানুষ সেই একজনা। **১৯১** ॥

রাগিণী বাহার – তাল খেম্‌টা।

প্রাণ দিয়ে যে ভালবাসে, প্রাণে তারে দেখ্‌তে চায়।
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, দাগ লাগায়ে নিতে চায়।
যে জন দিছে প্রাণ,তারে দিয়ে প্রাণ,
প্রাণের তানে প্রেমেরি গান, চুপি চুপি গেতে চায়। **১৯২** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল খেম্‌টা।

প্রাণের খেলা বড়ই মধুর, খেল্‌বি যদি আয়।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিতে হলে, প্রাণেরি মেলায়।
প্রাণেতে মিশাতে প্রাণ, প্রাণে ডাকে আয়রে ও প্রাণ।
করি প্রাণে প্রাণে প্রাণেরি গান, প্রাণে প্রাণ ডুবে যায়।
যদি পরে প্রাণেরি টান, রইতে কি আর পারেরে প্রাণ,
প্রাণে প্রাণে ঢেউ লাগিয়ে, প্রাণের হাসি ফুটে তায়। **১৯৩** ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

যাব না সজনি আর সে দেশে।
যে দেশের মানুষের সনে মন না মিশে।
স্বদেশে পড়িয়ে রব, বিদেশে আর নাহি যাব,
অনিমিষে চেয়ে রব, বাঁশী বাজায় কে এসে।
আকাশে পাতিয়ে কাণ, শুনিব বাঁশীর তান।
সঁপে দিব মন প্রাণ, চরণ উদ্দেশে।
অকৈতব প্রেমচ্ছটা, কৈতব হয় ঘোর ঘটা,
একা আমি সঙ্গে ছয়টা, চালায় তরী বেহুসে।
প্রাণের মানুষ প্রাণে লয়ে, আড়ালে রব লুকায়ে,
নিরবিলি কথা কব দু'জনে বসে।
প্রাণেতে মিশায়ে প্রাণ, গাহিব প্রাণেরি গান,
আকাশে উঠিবে তান, মানুষের তালাসে।
মানুষে মিশায়ে মন, কর মন আরাধন,
কহিছে মনোমোহন, আছে সে মানুষে। **১৯৪** ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঝাঁপতাল।

আড়াল থেকে চুপি দিয়ে, কি জানি কি কয়ে যায়।
আঁখিতে আঁখি না রাখিলে, শুধু ফাঁকিতে ঘুরায়।
আঁখিতে না দিলে আঁখি, ধরা যায় না প্রাণপাখী,
বিনাসূতে না বাঁধিলে, তারে বাঁধন বড় দায়।
নয়নে হানিয়ে বাণ, কেড়ে লও পুতুলের প্রাণ,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিয়ে সই, প্রেমের খেলা খেলি আয়।
ভক্তি ছাড়া মনোমোহন, দিতে নারে পায় না তার মন
অরণ্যে যেন রোদন, তেম্নি দশা বুঝা যায়। **১৯৫** ॥

রাগিণী বৃন্দাবনী ভৈরো – তাল আড়াঠেকা।

ডুব দিও না ভেসে থাক, হাসি রাশি প্রাণের মাঝে।
হাসি বড় ভালবাসি, তাই এ'সেছি তোমার কাছে।
পরমাত্মা পূর্ণশশী, ফুটাও তুমি ফুটুক হাসি,
সত্যসিন্ধু অবিনাশি, অমানিশি পালাক লাজে।
আনন্দে আনন্দময়, আনন্দ কর উদয়,
হাসির তোড়া "জয় দয়াময়", তোমার লাগি মন ছুটেছে।
প্রাণের মানুষ প্রাণপাখী, তোমায় দেখতে পাগল আঁখি,
দেখা তুমি দিবে না কি, লেখার ক'দিন বাকী আছে।
মনোমোহনের মন প্রাণে, তোমারে ধরিয়ে টানে,
আয় না মানুষ প্রাণে প্রাণে, প্রাণ মিশায়ে থাকি মজে। **১৯৬** ॥

রাগিণী বৃন্দাবনী ভৈরো – তাল আড়াঠেকা।

আজ কেনরে এমন লাগে – কি জানি হারিয়ে গেছি।
কে যেন মোর ছিল কাছে, আছে, কিন্তু নাই বুঝ্‌তেছি।
ছিল ছিল নাই নাই, ধরি ধরি পাই পাই,
আবার যেন হারাইয়ে যাই, ডুবাডুবি লাই খেলতেছি।
দেখায়ে স্বরূপ রূপ, ধরতে গেলে মারে ডুব।
তাতে আর বাড়ে লোভ, ধর্‌ব বলে বসে আছি।
খেল্‌তে খেল্‌তে বেলা হলে, তবু তারি লাগ্‌ না পেলে,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ব অকূলে, প্রাণে মরি কিবা বাঁচি।
গুরু আমায় বলে দিছে, সে সাগরে ডুবলে বাঁচে,
মনোমোহন তাই ডুব দিতেছে, ভাসি বলে দুঃখ পেতেছি। **১৯৭** ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল আড়া।

কার কে, কে কার, যে যার সে তার।
তার পরে আর, যার যার তার তার।
কে করে পাপ কেবা পুণ্য, আমি কি তুমি ভিন্ন,
এক আত্মা নাহি অন্য, মিজায় শূন্য নামে তার।
ত্রিগুণে ত্রিগুণা করে, লীলা নিত্য লীলা করে,
আমি আমার কে কয় কারে, ভাবিলে ঘুচে আঁধার। ১৯৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল পোস্তা।

যে যারে নিয়ত ভাবে সে তার স্বভাব পায়।
প্রেমিকের এম্‌নি ধারা, চোখ দেখ্‌লে তা চিনা যায়।
যে জন সহজে মজে, প্রাণপণে প্রেম ভজে,
সে যে প্রতিবিম্ব হয়, নির্ম্মল রূপের ছটায়।
হইলে প্রেম লোলুপ, শরীরে ধরে সে রূপ,
দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হয়ে, ভুবনে রঙ্গ খেলায়। ১৯৯ ॥

রাগিণী ললিত – তাল আড়া।

কে তুমি বিদেশীর বেশে দাও পরিচয়।
তোমার ভাব দেখে হয় বড় সন্দেহ উদয়।
তোমারি রূপচ্ছটায়, আবেশে অবশ কায়,
সহজে সরল প্রাণ, কেন যে গলিয়া রয়।
কি মোহিনী জান তুমি, মোহে কবলিত আমি,
অচেনা চোখের দেখা, একি হল এ সময়।
আর যে ভুলিতে নারি, আহা কি রূপ মাধুরী,

শয়নে স্বপনে জাগে, নয়নে নয়ন ময়।
এক্‌টী পলক তরে, দেখা দিয়ে তুমি মোরে,
কি যাদু করেছ যাদু, আমি হেরি তুমি ময়। ২০০ ॥

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

মরি মরি কি আনন্দ, অপরূপ হৃদি মাঝে।
মানুষ ঘটে মানস পটে, ঘটা'য়ে রাজরাজে।
কি ভাগ্য মানুষে ধরে, মানসে ধরিয়া তারে,
খেলে নিত্য লীলা ক'রে মানুষে সে বিরাজে।
কেলি কুতূহলে চিত, গাইছে অমর গীত,
কেবা যাবে পরতীত, মোহিত জীবসমাজে।
লোকলীলা বাহ্যভাবে, না পেয়ে সুদূরে ভাবে,
স্বভাবে বসিয়ে ভাবে, ভাবুক মজায়ে মজে। ২০১ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

মরি ! মরি !
কথা যে কয় কোথায় সে জন, ভেবে মরি।
কথায় কথায় কথার দোস্‌র, দেয়না ধরা ধর্‌তে নারি।
যে রয়েছে কথার মূলে, কয়না কথা হৃদয় খুলে,
মনের কথা পাইনা বলে, আমি সদা কেঁদে ফিরি।
কথার গোড়ায় খোদ মহাজন, কর্‌ছে নানা ভাবোদ্দীপণ,
করা যায়না তার নিরূপণ, সদায় খেলে লুকুচুরি।
ধর্‌তে যদি পাইতাম তারে, মনের মথা কইতাম্‌ হায়রে,
মনের মানুষ মণিকোঠায়, মনোমোহনের মনবিহারী। ২০২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল একতালা।

মানুষ হয়ে মানুষ লয়ে কর্‌গে যা মানুষ লীলা।
ধর্‌বি যদি সেই মানুষে, খুলে দে মানসের তালা।
মানুষে মানুষ আছে, ধর্‌গে মানুষ মান্‌সের কাছে,
মানুষে মানুষ পেয়েছে, বৃন্দাবনে ব্রজবালা।
পাইলে মানুষের সঙ্গ, উথলিবে প্রেম তরঙ্গ,
সাক্ষী আছে শ্রীগৌরাঙ্গ, কৈলাসেতে পাগল ভোলা।
আছে সাই মানসে বসে, মানুষে মানুষে মিশে,
কর্‌লে খেলা পাবি দিশে, ঘুচিবে ত্রিতাপ জ্বালা।
মনোমোহন দিশেহারা, হল না তার মানুষ ধরা,
আপ্তাবদ্দীন দিচ্ছে সারা, যোগ দিতেছে যোগের চেলা। ২০৩ ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল আড়াঠেকা।

মায়াতে আছে দয়া, কায়াতে ছায়ার মত।
মায়া কায়া লয় যোগে, ছায়াতে দয়া সতত।
অধরে মধুর হাস, জলদে বিজলী ভাষ,
কর্কশ রস প্রকাশ, হতেছে অশনি পাত।
বিজলী বজ্র যোগেতে, আছে প্রেম মানুষেতে,
সুমৃদু শীতল ভাষা, লভিছে সাধন ব্রত।
আলোকে আঁধার রেখা, অমৃতে গরল মাখা,
বিশ্বতত্ত্বে আছে লেখা, দেখরে মনের মত।
তত্ত্বহীন মত্ততায়, ভুল না মন মমতায়,
করুণার পূর্ণছবি, সত্বঃ রজ তমাতীত।
সদয় নিদয় ভাবে, ভাবরে প্রাণবল্লভে,
পাবে সে পদ পল্লবে, গরলশূন্য অমৃত। ২০৪ ॥

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

এই যে বিপুল বিশ্ব, আমি পরমাণু তার।
কি আছে শকতি মম, নিয়তি উপসংহার।
পূরিত কারণ জলে, কর্ম্মভূমি কুতূহলে,
মিছে বাঁধা কর্ম্ম ফলে, আমিত্ব মায়া বিকার।
হয়েছি প্রকৃতিলীন, তাই পুরুষত্ব ক্ষীণ,
অবসন্ন শক্তিহীন, বিপরীত অভিসার।
ঈশ্বরত্ব কোথা আর, নরত্বই গর্ভ তার,
প্রসব প্রকৃতি দেবী, সহে না যাতনা আর। ২০৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঠুংরী।

একি হেরি চমৎকার –
তোমারি বিভূতি বিশ্ব, কিছু নয় আমার।
আমিত্ব আরোপ করি, তুমি জীব দেহ ধারী,
তোমাতেই আমি, তুমি মায়ার বিকার।
তোমারই এ নর লীলা, অব্যক্ত বিচিত্র খেলা,
অখণ্ড কারণ সনে, কার্য্য ব্যবহার।
ঈশ্বরত্ব কোথা আর, নরত্বই গর্ভ তার,
প্রকৃতি প্রসব জীব, শিবচিন্তামণি সার। ২০৬ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল আড়াঠেকা।

ধূঁ ধূঁ করি শুধু হৃদয় শ্মশানে, অনলে অনিলে পেতে দিছ খেলা।
কামিনী কাঞ্চন, বাসনা কামনা, যোগাইছে তারা কাঠ খড়ি
চেলা।

জল জল করি শুনি কোলাহল, কোথা পাবে জল পিয়ে হলাহল,
আবেশে বিহ্বল ফুৎকারে অনল, আশা মায়াবিনী সুচতুরা
বালা।
দূরে কাল মেঘ সাজিছে কোণে, গুরু গরজন পশিছে কাণে,
আকাশে বাতাসে উঠিয়ে ধূঁয়া, আঁধারে ডুবিছে আলোক মালা।
ধীরে ধীরে পাখী যাইছে নীরে, পেছনে আঁধার আসিছে ঘিরে,
অই দেখা যায়, অমনি লুকায়, পথিকের চোখে, চমকে চপলা।
গৃধিনী শকুণি, শিবা আর কাক, ডাকিছে কৌতুকে শুনা
যায় ডাক,
বেতাল ভৈরব চৌদিকে নাচিছে, শাকিনী প্রেতিনী ভূত
প্রেত গুলা।
ঘোর অমাবস্যা অন্ধকার ঘোরে, বিভীষিকাময় এ শ্মশানোপরে,
কামনা চণ্ডাল শব বক্ষোপরে, বসিয়াছে মনো নিয়ে জপের
মালা।
এ শব সাধনা অতি ভয়ঙ্কর, চীৎকারে ফুৎকারে কম্পিত অন্তর,
ভরসা কেবল শ্রীপদে নির্ভর, মুখে মাত্র বাণী বববম্
ভোলা ।২০৭॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল পোস্ত।

তুমি আপন কিংবা পর –
বুঝ্‌তে নারি তাইত হরি, কেন্দে ফিরি নিরন্তর।
এত করাঘাত হৃদয় দুয়ারে, এত ডাকাডাকি ক্ষীণ কণ্ঠ স্বরে,
তুমি ঘুমের ঘোরে, লুটে আছ পড়ে, শুনেও শুন না না দাও
উত্তর।

আপন হলে পরে কে কারে কান্দায়, ডাক্‌লে এসে অম্‌নি
সমুখে দাঁড়ায়।
হয়ে ব্যথার ব্যথী, হয়ে সাথের সাথী, জীবন অবধি থাকে
একত্তর।
কই তুমি কই, ডাকি বারম্বার, শূন্য হতে ফিরে আহ্বান
আমার,
দূরে নাহি থাক, প্রাণে নাকি জাগ, কিছু বুঝি নাক চঞ্চল
অন্তর।
এ কথা সে কথা যত কথা বলি, বুঝ্‌তে নারি তাই আকুলি
বিকুলি,
প্রাণ লাগে খালি, তাই ত পর বলি, দিলে আত্মবলি নহ
স্বতন্তর।
কেমন করে আমি যাব তব পাশে, টেনে লয়ে যাও ধরে মম কেশে,
নৈলে যাওয়া আর, হলনা আমার, মনোমোহন তোমার
অজ্ঞান কোঙর।২০৮॥

রাগিণী সুরট মল্লার – তাল যৎ।

মন মাঝে যেন, কার ডাক শুনা যায়।
কে যেন আমারে, অতি সাধ ক'রে,
হাত দুখানা ধ'রে, কাছে টেনে নিতে চায়।
ইঙ্গিতে সঙ্কেতে পলকে পলকে,
কোথা যে'তে নারি, পাছে থেকে ডাকে,
শুনে সেই তান চম্‌কে উঠে প্রাণ, বলে কথা মান ফিরে আয় আয়।
অবহেলা করি দৌড়াইয়া যাই,
চৌদিকে নেহারি কিছু নাহি পাই,
ফিরে এসে কাছে দেখি হৃদিমাঝে, দাঁড়াইয়া আছে আমার অপেক্ষায়।

হেন প্রাণ বন্ধু হৃদয়ের স্বামী,
কাছে রেখে আমি দূরে দূরে ভ্রমি,
করি কত দোষ নাহি করে রোষ, সুজন পুরুষ মাখা মমতায়।
আমি হলে তারি সে হত আমারি,
নিলে তারি মর্ম্ম, কাট্‌ত কর্ম্ম ডুরি,
কেন কি কারণ নিলে না তার মন, বৃথা মনোমোহন নামটি ধরায়। ২০৯ ॥

রাগিণী সিন্ধুকাফী – তাল মধ্যমান আড়াঠেকা।

কে যেন আমারে, লুকিয়ে ডাকে মনমাঝে।
আমি কখনও পারি না তারি লাগি যেতে বাজে কাজে।
জনম অবধি সে আমারে চায়, ভুবন ভুলান তাঁর করুণায়,
বাঁধা আছি আমি যুগল রাঙ্গা পায়, ছাড়িয়া যাইতে মরি লাজে।
প্রেমানন্দে তাঁরে হৃদয়েতে রাখি, মুখোমুখী হয়ে আঁখি ভরে দেখি,
পরাণে পরাণ করে মাখামাখি, থাকিতে বাসনা চরণে মজে। ২১০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল আড়া।

আমি কি মরারে ডাকি –
জাগ্রত জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রকৃত, ভিন্ন কই মাখামাখি।
যে বলুক সে বলুক মরা মরা মরা, শূন্য শূন্য শূন্য অধরা অধরা,
আমি দেখি তারে ধরা, ধরা, ধরা, ধরাধরি করি দুজনে নিরখি।
চখে আছে লেগে কেন দেখিব না, হৃদে আছে জেগে কেন ডাকিব না,
কথা বলি শুনি, আপনা আপনি, নীরবে যখনি সেভাবে থাকি।
যারে পেয়ে আমি, আমি আমি বলি, যে গুণে ত্রিগুণে এত খেলাখেলি,

হৃদয়ে হৃদয়ে করে কোলাকুলি, আকুলি বিকুলি যাহার লাগি।
রসময়শ্যাম রসিক ত্রিভঙ্গ, ভুবন জুড়িয়া যাহার অঙ্গ,
করে কত রঙ্গ, সোহাগ প্রসঙ্গ, তরঙ্গে তরঙ্গে লাগে ঝুকাঝুকি।
যারে পেয়ে আমি, আমি তুমি জেতা, সে কি মরা কভু নাহি শুনে কথা,
আ রাম ! আ রাম! হরে হরে রাম, হৃদে জপে নাম হৃদয়ে থাকি।
মনোমোহন তারে পাইয়া পাইয়া, মন প্রাণ দিয়া গড়িয়া ভাঙ্গিয়া,
আঁকিয়া মুছিয়া হাটিয়া, বসিয়ে রয়েছে মুদিয়া আঁখি। ২১১ ॥

রাগিণী বাউল সুর – তাল খেম্‌টা।

যত সব কাণার হাট বাজার।
বেদ বিধি শাস্ত্রকাণা, আর এক কাণা মন আমার।
পণ্ডিত কাণা অহঙ্কারে, সাধু কাণা অবিচারে,
কাণায় কাণায় যুক্তি করে, যেতে চায়রে ভব পার।
কেউবা হয়ে দিনে কাণা, পরের দোষে দিচ্ছে হানা,
রাতকাণা কেউ শুয়ে শুয়ে, ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার।
কাণায় কয় কাণারে কাণা, আমার পথে চলে আয় না,
আচ্ছা মরি বাবুয়ানা, তোর পথে কি আছে সার।
কাণায় কাণায় ঠেলাঠেলি বেশ করতেছে গালাগালি,
মনোমোহন কেন কাণা হইলি, অন্ধ হয়ে থাক এবার।
আন্ধার খেলা ধান্ধার মেলা, বোবায় খাইছে রসগোল্লা,
আন্ধা ধান্দা বোবা কাণা, মজা লুটে নিছে তার। ২১২ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার – তাল ঝাঁপতাল।

সেই হয়েছে মানুষ রতন, সব থুয়ে যার কিছু নাই।
পরশমণি সরস ধনি, প্রেম সায়রে খেল্‌ছে লাই।
তুচ্ছ সম্পদ করে তুচ্ছ, সমান করে নীচ উচ্চ,
অন্তরে পেয়েছে রাজ্য, ফুল ফুটেছে আলেকসাই।
কুল কলঙ্কের ভয় রাখে না, কাণ থুয়ে সে ডাক শুনে না,
চোখ থুয়ে চোখে দেখে না, মুখ থুয়ে তার কথা নাই।
বেদ বিধানের নিষেধ মানা, কিছুই তার সে মানে না,
হৃদয়ে তার আরামখানা, সোণা রূপা ভাবে ছাই।
যোগ দিয়া সে একের ঘরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে,
ধনী বলি সে জনারে, না আছে ধনের বড়াই।
মনোমোহন তার অন্বেষণে, মত্ত আছে আকুল প্রাণে,
বিকাই জীবন শ্রীচরণে, এমন মানুষ যদি পাই। ২১৩ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল যৎ।

দূর্‌ বটে না পর বটে সে, আপন ঘরের আপন সাই।
তার আমার সন্ধান জেনে, সন্ধ্যা পূজা ছেড়েছি তাই।
যখনে থাকি যে কাজে, সে থাকে মোর কাছে, কাছে,
তার জন্যে কি ব'য়ে গেছে, সাধাসাধি কর্‌তে যাই।
ভাল কি বাসে না মোরে, তন্ত্র মন্ত্র কবজ করে,
বাধ্য কর্‌তে হবে তারে, ছি ছি লাজে ম'রে যাই।
সোহাগে আনন্দ হ'য়ে, ঘর কর্ত্তেছে আমায় লয়ে,
রাজি কি বেরাজি হক, তার জন্য ভাবনা নাই।
এ ব্রহ্মাণ্ড ভোজের বাজি, আপ্‌নি রাজা আপ্‌নি কাজি,
আপনে তরি আপনে মাঝি, সাজের কভু অন্ত নাই।
বহুরূপের মন মজাতে, বহুরূপী হবে সাজ্‌তে,

একরূপে যার মন ভুলেছে, সে দেখে সব এক জনাই।
পরের মতন ঘর করিয়ে, আপনি আছেন ধরা দিয়ে,
দূর বটে না পর বটে সে, মনোমোহন কয় মন ত চাই। ২১৪ ॥

রাগিণী ছায়ানট – তাল ঝাঁপতাল।

দীনবন্ধু হে – দীনের পানে ফিরে চেতে যদি তব দুঃখ হয়।
ভক্তের বাঞ্ছিত নাম, ছাড় তবে দয়াময়।
অকূল পাথারে হইয়ে পতন, দীনহীনে চায় চরণে শরণ,
তোমার তাতে দেখি নিত্য নিত্য হেলা, একি খেলা রসময়।
তোমার যাতে হয় নিত্য রস বোধ, তাতে হয় না মম চিত্তেরি প্রবোধ,
কিসে হবে বল ঋণ পরিশোধ, আত্মবোধ এ সময়।
তোমারই ইচ্ছা পূরণ করিতে, এত দুঃখ আমার হয়েছে সহিতে,
অভাব মোচন কার্য্যের পূরণ, করে দেহ পদাশ্রয়। ২১৫ ॥

রাগিণী বাউলসুর – তাল আড়া।

মন পাগল তুই মরবি কবে, (মরবি কবে, মরবি কবে)
তোমার ইচ্ছা মৃত্যু হবে যে দিন, সে দিন যদি সুখ পাই ভবে।
এক হতে বাড়ালি কত, হলিরে তুই আশা হত,
নিরাশায় ক্ষত বিক্ষত, তোমার মত কে হয় কবে।
সঙ্গে তোমার একটী মেয়ে, তার জন্যেতে আপনা খেয়ে,
যেখানে সেখানে যেয়ে, মূল হারালি কু-স্বভাবে।
আমি একটা জেতা মরা, ছেছড়াইয়া কল্লে সারা,
তোমার যোগে পড়ে ধরা, আমার ভরা ডুবে ডুবে।
ভেবে কয় মনোমোহন, আত্মহত্যা কর এখন,
তবে সে জুড়ায় জীবন, আনন্দ উদয় হবে। ২১৬ ॥

রাগিণী– সবে মিলে একই প্রাণে সুর – তাল যৎ।

আমার সবখানা মন পুটলী বেঁধে, রেখে দিলাম তোমার কাছে
দেখো যেন আর কেউ কখন, চুরি করে না লয় পাছে।
তুমি থাক মনের প্রহরী, মনই আমার টাকা কড়ি,
আমানত বিশ্বাসী হরি, তোমার মতন আর কে আছে।
মন আমার দরিদ্রের ধন, কে জানি তায় করে হরণ,
এক্‌লা প্রাণে ভয় করি তাই, চোর ডাকাতে সদায় খুঁজে।
ভাণ্ডার জিম্বা তুমি হলে – ভয় কি আমার ভূমণ্ডলে,
জান না কি অবোধ ছেলে, খুলে নেও হারাবে পাছে।
মনের পুট্‌লী তোমায় দিয়ে, মনোমোহন নিশ্চিন্ত হয়ে,
গাছতলাতে থাকুক শুয়ে, স্বপন দেখুক তোমার কাছে। ২১৭ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার – তাল ছোট চৌতাল।

তোমায় না হ'লে (একেবারে) ভাল লাগে না যে মন আমার।
তাই সে আমি, বারে বারে ফিরে, মুখ পানে চাই তোমার।
ধন মান যশঃ খ্যাতি, কিছার মিছার সাধন সিদ্ধি,
না হলে তোমাতে প্রীতি, দেখি যত ইতি অন্ধকার।
কর্ম্মে দিয়ে অনাসক্তি, শ্রীপদে দাও শুদ্ধা ভক্তি,
করে আমার চিত্ত শুদ্ধি, চিত্তে কর নিত্য বিহার।
দেখে তোমার প্রেম মুখ, পাশরে যাই সকল দুঃখ,
প্রাণের ভিতর তাই জাগুক, তুমি আমার আমি
তোমার। ২১৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

দেখে আমি তাজ্জব হয়েছি–
তোমার কর্ম্ম কেবল আর কিছু নয়, আঁকা আঁকি মুছামুছি।
শিশুর মত কলম লয়ে, নানা রঙ্গের কালী দিয়ে,
এ ব্রহ্মাণ্ড কাগজ পেয়ে, লিখ্‌তেছ সব ভোজের বাজী।
অবকাশ নাই দিনে রেতে, পরিশ্রম নাই খাট্‌তে খাট্‌তে,
মাখামাখি পাই না ধর্‌তে, জান্‌তে গিয়ে কান্দ্‌তেছি।
কই তুমি কই কারে বা কই, যারে কই সে শুনে বা কই,
আমি তোমার হই বা না হই, তুমি আমার ঠিক্ বুঝেছি।
মনোমোহন ভাবিয়ে বলে, নিত্য লীলা কুতূহলে,
লীলা নিত্য এক করিলে, মন বলে বেশ বুঝ পেয়েছি। ২১৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরি।

ইহা উহা করি বলে, থাক্‌তে নাকি পাও না ঠাঁই –
তুমি আমার হয়ে দেখ, আর কিছুনি কখন চাই।
তুমি থেকে আড়ে আড়ে, ভেল্‌কি দেখাও ঘুরে ফিরে,
দোষ ফেলিয়ে আমার ঘাড়ে, ভ্রুকুটি দেও চলে যাই।
মান অপমান লজ্জা খেয়ে, প্রাণের টানে বদ্ধ হয়ে,
তবু আবার চলি ধেয়ে, দেখি চেয়ে পাই কি না পাই।
একবার দুইবার না হয় তিনবার, কয়বার জানি না পাই কিনার,
ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে জীবন আমার, পুড়ুতে পুড়ুতে হল ছাই।
একবার হয়ে তুমি আমার, যা দেখ্‌তে চায় মন্‌টী আমার,
সেই প্রেমমুখ দেখাও তোমার, দয়াল নামের লাগে দোহাই। ২২০ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল খয়রা।

লাগ্ পাবি না অনেক দূরে –
বিবেক বুদ্ধি হারা হয়ে, হাত বাড়াইয়ে ডাকিস্ কারে।
যার জন্যে তোর ডাকাডাকি, তার সনে তোর মাখামাখি,
খুলে দেখ্ তুই জ্ঞানের আঁখি, বাকীর ঘরে ওসুল পড়ে।
যে ভাবে তুই ভাবিস্ তারে, সে ভাবেই সে খেল্‌তে পারে,
নিকটে কি অতি দূরে, হৃদিমাঝে অন্তঃপুরে।
উচ্চৈঃস্বরে গলাবাজি, কিছু নয় সে ধান্দাবাজী,
সহজ ডাকে হয় সে রাজি, যে তাহারে ডাক্‌তে পারে।
সহজং কেবলং কর্ম্ম, নিষ্কাম পরম ধর্ম্ম,
না বুঝে নিগূঢ় মর্ম্ম, মনোমোহনের মন ঘুরে।
জীবত্ব না হলে রোধ, হবে নারে আত্মবোধ,
আপনি আপন লও প্রবোধ, তা বই কিছু হবে নারে। ২২১ ॥

রাগিণী জঙ্গলা – তাল ঠুংরী।

করি করি কি করি তাই ভেবে দেখি কই।
যা করি তা কেন করি, যে করায় সে কই।
করায় কিম্বা আমি করি, বুঝা হইল বিষম ভারী,
কর্‌ব বলে কর্‌তে নারি, কেমনে আমি কর্ত্তা হই।
কে যেন মোর কাছে কাছে, হয়ত আগে নইলে পাছে,
বসে আছে ভুল ধরিছে, মাঝে মাঝে হারা হই।
ইঙ্গিতে সঙ্কেতে তার, বিশ্ব করে তোলপার,
আমার আমার আমি বা কার, যার আমি তার হয়ে রই।
মনো কয় তা হইলে আর, গোল বাজে না যায় আঁধার,
কর্ত্তা, কর্ম্ম ঠিক হইল যার, সে হইল জগতজয়ী। ২২২ ॥

রাগিণী– কি দিয়ে পূজিব ব্রহ্মময়ী – তাল ঠুংরী।

মন তোমারি শ্রাদ্ধের আয়োজন –
কর্‌ব এবার, বড় ব্যাপার, দেশ বিদেশে নিমন্ত্রণ।
যার থাকে না অধিকারী, নিজের শ্রাদ্ধ যায় সে করি,
আমি তুমি তেমন তরী, দুজনে মিলে একজন।
আশা ছিল তোমায় লয়ে, ভাঙ্গা তরীর ওভাই নেয়ে,
ভব পারে যাব ধেয়ে, করিব অরি দমন।
এখন তুমি দেওনা সাড়া, ভাবে বুঝি তুমি মরা,
তোমার জন্য লব ধড়া, বাউল পারা গিয়ে এখন।
জ্ঞান বৈরাগ্য তুল্‌সী তিলে, অষ্টপাশ আর রিপুদলে,
ভাব ভক্তি তার গঙ্গাজলে, কর্‌ব আমি নিবেদন।
বদন শর্ম্মা পড়ুবে গীতা, শুন্‌ব বসে তারি কথা,
মুড়াইয়ে আপ্‌না মাথা, গয়াতে কর্‌ব গমন।
দেহ প্রাণ পিণ্ড মেখে, দিব কুণ্ডলিনী মুখে,
যাবিরে আনন্দ লোকে, মনসুখে মনোমোহন। ২২৩ ॥

রাগিণী মল্লার – তাল কাওয়ালী।

কর্ম্মযোগে থাকে যদি, একদিন তবে পাবি দেখা।
আকাশপানে, চোখের কোণে, ঠিক রাখিস্ তুই আলোক রেখা।
হাসে রবি হাসে শশী, সে আলোকে মিশামিশি,
দিগ্‌দিগন্ত পরকাশি, হাসির ছবি দেখ্‌তে বাকা।
সরল প্রাণে তারি পানে, চেয়ে থাক রাত্রি দিনে,
নাই কিছু আর সে ধন বিনে, লতায় পাতায় নামটী লেখা।
লেখা দেখে শিক্ষা করে, দীক্ষা লয়ে ধর তারে,
মনোমোহন কয় ভিক্ষা দেরে, প্রাণের মানুষ পয়সা টাকা। ২২৪ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার – তাল কাওয়ালী।

ভাব গুরু ব্রহ্মময় পরম কারণ –
ওহে দেহধারী,দিতে ভব পারি, জ্ঞানতরি মাঝে কর আরোহণ।
আমিত্ব অজ্ঞানে নেত্র আবরিয়া, জ্যোতিঃ ঘনরূপ রেখেছে ঢাকিয়া,
ভাব আত্মজ্ঞান, ছুটিবে অজ্ঞান, জ্ঞানময় ব্রহ্ম কররে স্মরণ !
আমি কে তুমি কে আমি তুমি ভরা, কোথায় রল স্রষ্টা, সৃষ্টি ক'রে ধরা,
দৃষ্টি কর তাতে, আমাতে তোমাতে, জ্ঞানাঘাতে হবে সংশয় ছেদন।
মৃত দেহের দেহী, করিতে শোধন, দেখি শ্রাদ্ধবিধি পিণ্ড প্রয়োজন,
ভাব ব্রহ্ম অণ্ড, যত কর্ম্মকাণ্ড, সব লণ্ড ভণ্ড হইবে তখন।
দেহ দেহী যত জল বিম্ব প্রায়, চৈতন্য তরঙ্গ শক্তিতে খেলায়,
কেন ভাব এত, হবে নারে প্রেত, ব্রহ্মময় জগত সত্য নিরুপণ।
ভাব সত্য গুরু, নিত্য নিরঞ্জন, জ্ঞানসিন্ধু জলে করবে তর্পণ,
হবে ভ্রান্তি নাশ, স্বতঃ স্বপ্রকাশ, হইবে প্রকাশ কহে মনোমোহন।
যার যেই ভাব তার সেই লাভ, জ্ঞানে কর বোধ অজ্ঞতা স্বভাব,
ছাড় অপলাপ অসত্য প্রলাপ, সত্য তত্ত্বমসি চিন্ত বিচক্ষণ। ২২৫ ॥

রাগিণী মল্লার – তাল ঝাঁপতাল।

এপার থেকে জান্‌তে চায় মন, ও পারের খবর।
কি ছিলাম কি হব শেষে, মরণের পর।
যাদেরে আদর্শ মানে, বাইবেলে বেদে কোরাণে.
যার যার ভাবে তারা টানে, না মানে একে অপর।
পুরাণে কয় জন্ম মৃত্যু, কর্ম্মই তাহার হেতু,

কর্ম্মফলে সঙ্গে চলে, নাহি পায় অবসর।
বাইবেলে কোরাণে তার, এক দিনে করে বিচার,
বেহেস্ত দোজখ যেতে হবে, কেয়ামতের পর।
কৃষ্ণভক্ত ব্রজবাসী, শিবভক্ত কৈলাশ কাশী
হরিনামে বৈকুণ্ঠধাম, বৌদ্ধ পরাৎপর।
যোগী কয় যোগেতে বসি, তারি সঙ্গে যাব মিশি,
দ্বৈতবাদী বলে হাসি, হব তারি অনুচর।
কেহ বা ভাবে গোলক, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ লোক,
দেব লোক ভেবে শোক, নিবারে কার অন্তর।
কেহ কয় জন্ম একবার, কেহ লক্ষ কোটি কয় বার,
আসা যাওয়া ভ্রমিতে হয়, নানা যোনি নিরন্তর।
লিঙ্গ দেহ মুক্তি তরে, কেহ পিণ্ড দান করে,
মনোমোহন কয় ভেবে দেখ, নহে অগোচর।
এক যদি হয় সবার গোড়ে, সবাই যদি স্বীকার করে,
আদি অন্ত একই তবে, নাহি হবে স্বতন্তর।
মাটি দিয়ে কুম্ভকারে, ঘট আদি যত গড়ে,
এক হয়ে যায় ভাঙ্‌লে পরে, নয়ন গোচর।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, যে নিত্য সে লীলা করে,
লীলা নিত্য এক করে, সাধক হয় অমর। ২২৬ ॥

রাগিণী বারোয়া মূলতান – তাল কাওয়ালী।

বেশ্‌তো আছ ভাল, বাজায়ে খেম্‌টা তাল, ভেবে দেখনিরে মধ্যমান
কোলে লয়ে ডব্‌কী, বাজাইছ ছব্‌কী, ব্রহ্মতালে নাহি জ্ঞান।
অহঙ্কার চৌতাল, বাজাইছ ধামাল,
সুর ফাক্ আড়াঠেকার, রাখনি সন্ধান।

ঠুংরী ঠেস্ কাওয়ালী, ভেবে দিন কাটাইলি,
তেতালায় বেতালা হয়ে ফাকে দিলি মান।
সোহিনী সুরটে, বেশ্‌ত আছ বটে,
আশা ভূপালিতে, ধরিয়ে সুতান।
যৎ পোস্ত আড়া, পুত্র কন্যা তারা,
রূপক তালে গায়, বাহার আর কল্যাণ।
সারঙ্গ ভৈরবীতে, মধ্যাহ্ন প্রভাতে,
বন্ধু জনায় গায়, সুললিত গান।
পূরবীর কালে, হায়রে রুদ্র তালে,
দীপক দিবে জ্বেলে, নাহি পরিত্রাণ।
কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুরে, সকল ভেঙ্গে চু'ড়ে,
পঞ্চম সোয়ারী গাবে হরিগুণ গান।
ভেবে মনোমোহন, পরজেতে মন,
একতারা বাজায়ে, সাধিছে মূলতান। ২২৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল কাহারবা।

তোমারি লাগিয়ে শুধু, তোমায় ডাকি প্রাণপুতুল।
তুমি আমি নাম আর নামী, এক বৃন্তে দুটী ফল।
ধর্‌তে তোমায় দিতে ধরা, হয়ে আছি পাগল পারা,
ভেবে সারা আপন হারা, তরঙ্গে তরঙ্গে দুকূল।
আমার প্রাণ তোমারে টানে, তোমার টান আমারি প্রাণে,
প্রাণে প্রাণে টানে টানে, হাসি কান্না খেলায় দোল। ২২৮ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল একতালা।

অচেনা এক পাখি আমার, খাঁচার ভিতর করে খেলা।
ধর্‌তে পার্‌লে মন বেড়ীতে, বেঁধে ফেলতাম্ এই বেলা।

পাখী কেমনে আসে কেমনে যায়, টের পাওয়া বিষম দায়,
ভাত জুটে না দুই বেলা তার, খেতে চায় সে দুধ কলা।
পাখী আড়ালে লুকিয়ে থাকে, কত মধুর ডাক ডাকে,
স্বভাবের ছবি আঁকে, বসে বসে সারাবেলা।
জ্ঞান ধনুতে ভক্তিবানে, বিঁধতে পার্‌লে পাখীর প্রাণে
মিশে যায় প্রাণে প্রাণে, বদল হয় প্রেমের মালা। ২২৯ ॥

রাগিণী সাহেনামিশ্র – তাল খেম্‌টা।

জ্বাল্ জ্বাল্ জ্বাল্ প্রেমের বাতি, হৃদি আলো করে।
নিবায়ে দে মায়ার প্রদীপ, বিবেক হাওয়ার জোরে।
মায়াতে দয়া মিশায়ে, দেহতরী দে ভাসায়ে,
অনুরাগের বাদাম দিয়ে, চালাও তরী ভক্তিদাড়ে।
জ্ঞানের হাল্‌টি রেখ দড়, পারাপার তাতে নির্ভর,
বিশ্বাসে আশ্বাস কর, নির্ভর সরল অন্তরে।
ঘূর্ণিপাকে ঘোর বিপাকে, প্রাণ ভরিয়ে ডেক তাকে,
পড়লে পরে উজান বাকে, ভক্তিগুণে টে'ন ধ'রে।
ঘটাতে ঘোর প্রলয়, তাতে কত কুহাওয়া বয়,
মনোমোহন কয় হয়ে নির্ভর, বল – জয় দয়াময় বদন ভরে। ২৩০ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল কাওয়ালী।

উদাস প্রাণে বুঝ্‌তে নারি কারে জানি চায়।
যে আমারে ধরে টানে, তারে কোথা পাওয়া যায়।
আড়ালে নিঝুম হয়ে,কেন সে বীণা বাজায়ে,
থাকি থাকি উঁকি দিয়ে আবার লুকায়ে যায়।
নিরখিতে যেই চাঁদে, নীরবে এ প্রাণ কাঁদে,

সে চাঁদ পড়েছে ফাঁদে, বেঁধে দিবে কে আমায়।
চাঁদের কি দিব তুলনা, অমাবস্যা নাই পূর্ণিমা,
অনুপমা মনোরমা, পরিপূর্ণ জোয়ার ভাটায়।
অবিশ্বাসে রাহুগ্রাসে, সে চাঁদ কেবল কাঁপে ত্রাসে,
কামরতিতে মেঘে ঢাকে, প্রেমেতে হাসি খেলায়।
মনোমোহন বেহিসাবি, বল্‌ব কি আর তার বেকুবি,
কর্ম্মদোষে গেছে সবই, অকূলেতে ডুবে যায়। ২৩১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

কেন প্রাণ টানে এত রমণীর পাণে।
কি ধন আছে তারি মাঝে, কেও কি তা জানে।
মহাদেব কিছু জেনে, স্থান নিয়েছে ঐ চরণে,
মরে আবার বেঁচে উঠে, তারি কৃপাগুণে।
একদিন হয়ে অন্নহারা, ভ্রমেছিল এই ধরা,
অন্ন দে অন্ন দে বলে, ভিক্ষা মাগে চরণে।
কিছু জেনে নন্দের কানু, নৈদায় ধরে নারীর তনু
প্রেমেরসে বিবশ হয়ে, ঐ নাম জপে বদনে।
খুঁজে দেখ পাবে না টের, তার মাঝেতে আছে যা ফের,
তুমি আমি বাঁধা আছি, অই এক সন্ধানে।
পতিকে উদরে ধরে, আবার প্রসব করে,
তার রাজ্য ছাড়া কার্য্য দেখে, ভয় লাগে মনে।
ভেবে কয় মনোমোহন, কি করি বল এখন,
জেনে শুনে ধর্‌তে নারি, বল্‌তে পারিনে।
পঞ্চপ্রেম একাধারে, রমণী হৃদে বিহরে,

তাই সে তারা ভুলায়ে রাখে জগত জনে।
ভুল ভাঙ্গিতে আছে যে পথ, পরম গুহ্য সে মত,
ধরা দেয় সে, যেতে পার্‌লে, ভাটী বেয়ে উজানে। ২৩২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল একতালা।

তুমি বেদাতীত মায়াতীত, সে কথা আর জান্‌তে চাইনা।
শুধু ডাক্‌তে চাই মা, মা ! মা ! বলে, দেখ্‌তে চাই চরণ দুখানা।
(মাগো !) সপ্তদশ বর্ষাবধি, পড়্‌লেম কত বেদ বিধি,
কিছুতে না পেলাম বিধি, নিরবধি ভেবে শ্যামা।
(মাগো !) আমি তুমি বুঝ্‌লাম জ্ঞানে, দেখ্‌লাম জ্যোতি যোগধ্যানে,
তৃপ্তি নাহি হল মনে, অবোধ প্রাণে বুঝ্‌তো মান্‌ল না।
মা ! তোমারে জান্‌তে গিয়ে, কান্দলেম কত আকুল হয়ে,
কত আছাড় খেলাম ধেয়ে ধেয়ে, প্রাণ দিয়েও ত্রাণ পেলাম না।
মাগো ! করাইলি বিষপান, আরো কত অসম্মান,
তবু নাহি গেল প্রাণ, মনের আশা ফুরাইল না।
মগো ! মত্ত হয়ে অনুরাগে, মাতাইলাম হাঁকে ডাকে,
কোল দিলাম মা, যাকে তাকে, কেও আমাকে চাহিল না।
পাইয়ে এত লাঞ্ছনা, তবু ত প্রাণ ফিরিল না,
আর জানি কি আছে গো মা, ভেবে আকুল পাগল মনা। ২৩৩ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল খেম্‌টা।

হুজুরেতে আর্‌জী দিয়ে, ভাঙ্গা ঘরে আছি বসে।
ক'রে উকীল খারা, যেমন ধারা, খাড়ার ভয়ে কাঁপি ত্রাসে।
সওয়াল জবাব হচ্ছে দিন দিন, শোধ হইল না পুলিশের ঋণ,

কি করি অতি কঠিন, দীনহীন কি দিয়া তোষে।
কেবল সত্য কথার জন্য, সাক্ষী চাই তার অগ্রগণ্য,
স্বীকার আমি পুণ্য শূন্য, পাপে ভরা হারা দিশে।
হাকিম তুমি অন্তর্য্যামী, জানকি কর্ত্তেছি আমি,
করে দেখি সালতামামী, আপনি মরি আপন দোষে।
উকীল কিন্তু জেরা করে, পতিত পাতকী তরে –
তোমার দয়াল নামের জোরে, গোল মিটে যায় আপোষে।
মনোমোহন দিশে হারা, কল্লে কি তায় হবে জেরা,
অহঙ্কারে মতোয়ারা, আপন হারা অবিশ্বাসে। ২৩৪ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল ঝাঁপতাল।

তোমার দয়াল নামের দোহাই দিয়ে ভেসেছি ভব সাগরে।
কূল দাও কি অকূলে ভাসাও, প্রাণ সমর্পণ তোমারে।
অকূলে তরঙ্গ দেখে, কাঁপে প্রাণ থেকে থেকে,
ভয় পেয়ে তোমারে ডেকে, ডুবে কি যাইব মরে।
শুনিয়াছি আর্ত্তজনে, দয়া কর নিজ গুণে,
তাই বড় ভরসা মনে, সাহস করি অন্তরে।
করুণা করি কাতরে, লয়ে যাও হে কেশে ধরে –
প্রভু তোমার সঙ্গে করে, একা যেতে ভয় করে।
ভজন সাধন বিনা, ভাব্‌ছি যেতে পার্‌ব কি না,
মনো কয় কেন পার্‌বি না, কত পাপী গেছে তরে।
অসাধ্য কি নামের জোরে, সকলি হইতে পারে,
আপ্‌নি গেছেন প্রকাশ করে, দোহাই দিলে যম ফিরে। ২৩৫ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী – তাল যৎ।

দয়াময়ের পূর্ণ আবির্ভাব হইল জগতে।
দেখরে সুবোধ জন, ভজন মাধুরীতে।
হৃদয়ে আছে রতন, যতনে মিলে সে ধন,
জপ ধ্যান অনুরাগে, সেবা কার্য্য নিত্য ব্রতে।
করুণার পূর্ণছবি, হৃদয়ে উদিত রবি,
আঁধার ভেদিয়া ছুটে, কিরণ ধারা বক্ষেতে।
পাপ তাপ অবসানে, আইল শান্তি পরাণে,
যুগধর্ম্ম মর্ম্মভেদি, লাগিল আলো মনেতে। ২৩৬ ॥

রাগিণী ভজন – তাল একতালা।

অমৃতময় রবি করুণা কিরণ দানে –
আকাঙ্ক্ষাতে দীনহীন, তোষ নাথ আকিঞ্চনে।
চিরদিন পিপাসিত, করুণা কণা বঞ্চিত,
ভবভয়ে তরাসিত, তিরপিত কর এক্ষণে।
প্রভুহে পরমাহ্লাদ, সহিতে নারি ব্যাঘাত,
পূরণ কর সাধ, বাদ বিবাদ মোচনে।
তোমার রূপ মাধুরী, পারি না রাখিতে ধরি,
অবশ মন আমারি, কি করি দুর্ব্বল প্রাণে।
দুর্ব্বলে করি সবল, কর প্রাণ সুশীতল,
তুমি ধর্ম্ম হিমাচল, পদ কমল আস্বাদনে।
পাইয়ে অন্তঃশীতল, হই নিত্য নিরমল,
প্রেম যমুনার জল, সিঞ্চিত সুধা বর্ষণে। ২৩৭ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল একতালা।

হৃদি মাঝে আছে তব জাগ্রত প্রেমের ছবি।
বহুরূপে করে লীলা কিরণ বিতরে রবি।
শিব কৃষ্ণ কালী ভাবে, প্রকাশে নিজ স্বভাবে,
তারি মাঝে খেলা করে, বর্ত্তমান ভূত ভাবী।
নাহি তার কালাকাল, কালেতে যোগ মিশাল,
বিনাশ রহিত ভাবে, মধ্য বিন্দু আছে ডুবি।
লীলাতে ভাসিছে নিত্য, জাগাইতে মূঢ় চিত্ত,
আগুলিল পথ আসি, মায়াতে সব কল্প দেবী।
বিলাসে প্রকাশি মর্ম্ম, শুদ্ধযোগে এল কর্ম্ম,
রহিত হইল অধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ্য প্রাণে শোভি। ২৩৮ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার – তাল যৎ।

হিমাচল চূড়া হতে বিন্দু বিন্দু কণা নিয়া
কণাতে ঝরণা যত সকলি যোগে মিশিয়া।
নামিছে ক্ষিতি মণ্ডলে, কল্যাণ আছে কৌশলে,
এই দেখ সহস্রদলে, হিমাচল গড়াইয়া।
অধোমুখে গতি ধারা, তাহাতে মানুষ ধরা,
হিল্লোলে খেলে তরঙ্গ, রঙ্গভঙ্গ করিয়া।
ফিরাইয়া দিলে গতি, জ্বলে জ্বলে দিব্য ভাতি,
ভগবান ভগবতী, হৃদি আলো করিয়া।
প্রেমরসে মাতোয়ারা, দেখিয়ে আপন হারা,
অনিমিষে দাও পাহারা, নৈলে যাবে ছুটিয়া।
গঙ্গা যমুনা নামে, যুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে,
আছে লিঙ্গ অভিরাম, অপরূপ ধরিয়া।

প্রেমে আকর্ষিয়া বারি, স্নান করাও ধীরি ধীরি,
পুলকে আলোকে ঘিরি, দিবে আলো জ্বালিয়া।
সে আলোকে হৃদিচাঁদে, পূজরে পরমাহ্লাদে,
বদ্ধ হয়ে মিছা দ্বন্দ্বে, থেক না কভু মজিয়া।
লীলাতে আছে মাধুরী, খেলিছে রস উগারি
লীলা নিত্যময় হরি, সাধরে সর্ব্বস্ব দিয়া। ২৩৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু – তাল ঠুংরী।

আয় যাবি মন দেখে আসি –
জলের উপর ভাসে পদ্ম, তার উপরে হাসে শশী।
সাড়ে তিন পেচ বেড়ার মাঝে, পৈতৃক ধনের গোলা আছে,
সাপিণী তার চৌকি দিছে, নীচে গয়া গঙ্গা কাশী।
সাপিনীর হুহুঙ্কারে, কাছে কেহ না যায় ডরে,
সাপ ধরা সেই মন্ত্রের জোরে, সাহস করে খুব সাহসী।
দাঁড়াইলে তার কাছে, অমনি সাপে মাথা গুজে,
মনোমোহন কয় আগে পাছে, ঠিক থাকিলে মিলে হাসি। ২৪০ ॥

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

হাসিমুখে আসিয়াছি কেঁদে কেন চলে যাব।
দিয়ে হাসি, অশ্রুরাশি, কেন উপহার লব।
প্রাণের হাসি, ঠোটের কোণে, মিশিতে কভু দিবনে,
যখন বিষাদ আসবে ধেয়ে, নিভৃতে লুকায়ে থুব।
সময় পেলে আবার টেনে, তুল্ব তারে ঠোটের কোণে,
আপ্না হাসি আপ্নি দেখে, আত্মহারা হয়ে যাব।
সংসারের ঘোরাবর্ত্তে, মর্ত্ত্যের কণা যখন মর্ত্ত্যে,

হাস্‌তে চাবে যখন, একবার সে হাসি হাসিয়া লব।
শৈশবে যা দিছি দান, খুঁজে লব তার প্রতিদান,
হাসির বদল হাসি পেয়ে, হাসি দিয়ে ব্যোম মাতাব। ২৪১ ॥

রাগিণী গৌর সারঙ্গ – তাল কাওয়ালী।

সিদ্ধযোগ দান কর হরি দয়াময় নামে।
দাওহে অমৃত সাধন পঁহুছিতে ব্রহ্মধামে।
করি বিষয় ভাবনা, পেতেছি বহু যাতনা,
দূর কর এ লাঞ্ছনা, ভুলায়ে রেখনা কামে।
অভ্রান্ত সাগর তুমি, পথ ভ্রান্ত পান্থ আমি,
বিপদে নিও না কভু, দক্ষিণে কি বামে।
প্রতিপলে অনুক্ষণে, ঠিক রেখ দিগ্‌দর্শন,
তা হলে মনোমোহন, যেতে পারে ব্রহ্মধামে। ২৪২ ॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল আড়াঠেকা।

মনের বল দাওহে প্রভু শিব সাধনে।
অকলঙ্ক শশী তুমি, মিশে থাক প্রাণে প্রাণে।
বিকশিত সে নলিনী, প্রেমময়ী মা জননী,
চঞ্চল মন মধুপ, সে কমল মধুপানে।
রসযুত সে অমৃত, দিয়ে নাথ অবিরত,
সতত সাধন ব্রত, রক্ষা কর এ জীবনে।
অভাবে নূতন ভাবে, রূপে রসে ভেসে ডুবে,
আশাপূর্ণ হবে আশা, তোমারই শ্রীচরণে।
শুদ্ধপ্রেমে সিদ্ধদান, কর দিয়ে পূর্ণজ্ঞান,
মৃতসঞ্জীবন রস, প্রেম সমুদ্র মন্থনে। ২৪৩ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী – তাল ঝাঁপতাল।

হের কি দয়াল নামে সকলি সম্ভবে।
অসাধ্য সাধন যত হতেছে এই ভবে।
অচল যেতেছে হেটে, বোবার মুখে কথা ফুটে,
অন্ধজনে আঁখি মেলে, দেখিতে পাইছে সবে।
শুক্‌না গাছে ফল ধরিছে, পাষাণেতে ফুল ফুটিছে,
প্রকৃতি ভুলিয়া গেছে, আপন স্বভাবে। ২৪৪ ॥

রাগিণী দেবগিরি – তাল ঠুংরী।

দয়াময় নাম সুধাকরে বিতরে অমৃত কিরণ।
আয়রে জগতবাসী, লভিতে পরম ধন,
পাপী তাপী দুঃখী নর, হও সবে অগ্রসর,
জুড়াতে ত্রিতাপ জ্বালা, চরনে লহ শরণ।
এমনি নামের গুণ, যেন বাতাস আর আগুণ,
ঠেলে উঠে ফুটে ব্রহ্ম, সচ্চিদ্ আনন্দ ঘন।
সবে অবারিত দ্বার, ছোট বড় নাই বিচার,
দেখ্‌বি যদি আয় সকলে, ডাকিছে মনোমোহন। ২৪৫ ॥

রাগিণী বাউল সুর – তাল খেমটা।

পায় ধরে কই গুরু ভজ, যাইও না মন কুপথে।
সোজা রাস্তায় চলরে ভাই,ভবের বোঝা নিয়ে মাথে।
কন্টকে বাড়া'য়ে পাও, দুঃখ পে'ও না মাথা খাও,
আনন্দে হরি গুণগাও, কেও যাবে না কার সাথে।
আস্‌বে সমন বাঁধ্‌বে ও মন, শুন্‌বে না কার বিনয় বারণ,
হুঁসে থেক কয় মনোমোহন, ধরে চরণ যোড়হাতে। ২৪৬ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল ঠুংরি।

আমি আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্য পরিচয়।
আমি আমার জানা কি আর শাস্ত্র পড়ে কভু হয়।
প্রাণে আছে ভাবের লেখা, স্বভাব নিলে পাবে দেখা,
খুঁজ্‌তে হয় সে একা একা, দুজনার কার্য্য নয়।
ছেড়ে দিয়ে অন্য লোভ, দিল্ দরিয়ায় দিলে ডুব,
আপ্‌নি আপন ভাসে রূপ, স্বরূপেতে হয়ে লয়।
আমি আমার গুরু শিষ্য, ভাসে বিশ্ব দৃক্ দৃশ্য,
বিশ্বাসী দেখে অবশ্য, আস্য তার হাস্যময়।
কর্ম্মাকর্ম্মের সমাচার, সকলি জানা তাহার,
তারে তারে মিশালে তার, দেখ্‌বে সত্য কথা কয়। ২৪৭ ॥

রাগিণী বিভাস – তাল আড়াঠেকা।

যে দিন আমার ভবলীলা হবে অবসান।
তার কিছু পূর্ব্বে মায়ামুক্ত করে দিও ভগবান।
এই ভিক্ষা তোমার কাছে, এ দাস কাতরে যাচে,
টানাটানি করে যেন, ছিড়ে নাহি যায় প্রাণ।
হরি তুমি, ভকত বৎসল, প্রাণে দিও প্রেমেরি বল,
কেটে দিও মায়ার শিকল, আনন্দে করি আহ্বান।
মমতার রজ্জু দিয়া, আমারে নিও বাঁধিয়া,
সংসার হতে কাড়িয়া, তোমার কোলে দিও স্থান। ২৪৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল একতালা।

শোক নহে সাধনা তোমার।
ধাইছে অনন্ত স্রোত, অনাহত গতি তার।
মনেরই আকর্ষণে, পরোক্ষে তোমারে টানে,
মুহুর্ম্মূহু কান্দে প্রাণ, ধরিতে কায়া মায়ার।
ছদ্মবেশী আলো করা, তারে নাহি যায় ধরা,
ছুটে ছুটে আসে প্রাণ, মরিচিকা ভ্রান্তি তার।
ক্রমে সে কারণ সনে, মিশে যেয়ে সঙ্গোপনে,
তারি পদে লয় হয়, অশ্রুজল হাহাকার। ২৪৯ ॥

রাগিণী গুজরাটী – তাল আদ্ধা।

আসিতে পথ ভুলিয়া, গিয়াছি দূরে সরিয়া,
গহণে শুধু ঘুরিয়া, গেল যে সারাটি বেলা।
করুণা পুনঃ করিয়া, করেতে যদি ধরিয়া,
না যাও সাথে লইয়া, কাঁদিব আমি একেলা।
তোমারি নাম লইয়া, আঁধারে যদি পড়িয়া,
জীবন যায় কাঁদিয়া, এ বড় বিষম জ্বালা।
আপন জন বলিয়া, সকল দোষ ভুলিয়া,
টানিয়া লও তুলিয়া, দিয়া চরণধূলা ।২৫০ ॥

রাগিণী ভাটীয়াল – তাল কাহারবা।

আমায় তুমি নেওনা টেনে –
এদেশে বাঁধিয়া রাখ্‌ছে, কামিনী কাঞ্চনে ॥
অনেক দিন হয় সঙ্গছাড়া, হয়েছি জীয়ন্তে মরা,

তোমার কাছে যেতেরে প্রাণ, প্রাণ আমার সদাই টানে।
এতকাল এসেছি হেথা, না পাই কোন খবর বার্ত্তা,
ঠিকানা ভুলিয়া আমি, কান্দি কেবল রাত্রি দিনে।
একা মোরে এ বিদেশে, পাঠায়ে কোন্ সাহসে,
আছ তুমি ঘরে বসে, হৃদয় বান্ধি পাষাণে।
একবার তুমি করে স্মরণ, প্রাণের জ্বালা কর বারণ,
তুমি যে নাথ কার্য্য কারণ, মনোমোহন খুব তা জানে। ২৫১ ॥

রাগিণী সাহেনা – তাল ঝাঁপতাল।

যতই ভাবি ততই ডুবি, পাইনা ভাবের কূল কিনারা।
ভাবিলে ভাবীর ভাবে, হয়ে যাই যে আত্মহারা।
ভাবের সাগর গভীর ভারি, ভাব বুঝিয়ে মন ডুবুরী,
ডুব্ দিয়ে যা অতল তলে, দেখ্‌বিরে মুখ ভাবে ভরা।
ভাবের ঘরে ঢুক্‌লে পরে, অভাবে তায় ধর্‌তে নারে,
ভাবীর ভাবে মন মজিয়ে, হয়ে যায় যে ভাব বিভোরা। ২৫২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

আলোকে আঁধারে, বহুরূপ ধ'রে নিশি দিবা কর খেলা।
কে তুমি কি নাম তব, অবসর নাই সারা বেলা।
মলয় বাতাসে ফুটে ফুল কলি, মধু লোভে তার জুটে কত অলি,
প্রভাতে সন্ধ্যায়, বিহগে গীত গায়, চাঁদনী বিতরে আলোক মালা।
সাজে সাজে এই সাজায়ে ধরণী, লুকাইয়ে তার ভিতরে আপনি,
আপনি আপন করিয়ে গোপন, ভুলায়ে রেখেছ নিজে হয়ে ভোলা। ২৫৩ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল লোফা।

তোর সনে মোর আছে কি সম্বন্ধ।
তোমায় আমায় আজ দুজনায় লাগ্‌ল বিষম দ্বন্দ্ব।
তুমি আমি জগৎ জোড়া, আমি কি আর তোমায় ছাড়া,
ডাক্‌লে কেন পাইনা সাড়া, কোন কলে রয়েছ বন্ধ।
মঙ্গল নিদান তুমি, সবই জান অন্তর্য্যামী,
যেম্‌নি ঘুরাও তেম্‌নি ঘুরি, তবে কেন ভাল মন্দ।
যা কিছু যায় চক্ষে দেখা, সব জিনিষে সত্য লেখা,
তুমি আমি মাখন মাখা, দেখেনা কেন আঁখি অন্ধ।
চোখ্ বেন্ধে কও দেখ চেয়ে, সুর নাই বল শুনাও গেয়ে,
সাধ্য ছাড়া সাধ লুকায়ে, ঘটাইতেছ যত মন্দ।
মনোমোহন কয় কি সম্বন্ধ, আমি ফুল তার তুমি গন্ধ,
একাক্ষর অনেক ছন্দ, অচ্ছিদ্র বিষম রন্ধ্র। ২৫৪ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল যৎ।

ভাব অভাবে খেল তুমি সতত স্বভাবের খেলা।
ভাবেতে প্রাণ মেতে উঠে, অভাবেতে হয় উতালা।
সাধ্যযোগে পেতে সাধন, ব্যাকুল হৃদয় মন,
সংগ্রাম কর শোধন, না বুঝিয়ে করি হেলা।
ভাব অভাবে লেগে দ্বন্দ্ব, আসিতেছে ভাল মন্দ,
ভাবের চাবি করে বন্ধ, ঘুরাইতেছ মানুষ গুলা।
গুরু ব্রহ্ম আত্মারাম, সাধনে সিদ্ধ আরাম,
পূর্ণ করে মনস্কাম, বিরাম দেহ এই বেলা। ২৫৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল খেম্‌টা।

তোমার এইসব ভেল্কিবাজী, বুঝে উঠা ভার।
তুমি ভেল্কি দিয়ে জগৎ ভুলাও, হাতে লয়ে জীয়ার হার।
খেম্‌টা খেয়াল, আদ্ধা চৌতাল, ঠেস্ কাওয়ালী ঠুংরী ধামাল,
তাল বাজায়ে সামাল সামাল, বাহবাতে দাও চীৎকার।
কখন মার কখন বাঁচাও, কাঠের পুতুল কলে নাচাও –
কখন ছুটাও কখন হঁটাও, আজগুবি আজব ব্যাপার।
কখন রোগী কখন ওঝা, কখন বেকা কখন সোজা,
যায় না তোমার স্বভাব বুঝা, আত্মারাম সরকার।
ভেল্কি ভাঙ্গা মন্ত্র আছে, শিখ্‌লে তাই ওঝার কাছে,
সব দেখে সেই মিছে মিছে, পিছে নাচে খেলোয়ার।
ভোজরাজা আর ভানুমতী, ভেল্কি খেলায় দিবা রাতি,
মনোমোহন কয় খড়ি পাতি, ধান্ধাবাজী এ সংসার। ২৫৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

বায়ুকোণে মেঘ সেজেছে, ছুটিল তুফান।
নদীর জলে ঢেউ খেলিছে, সামাল তরীখান।
গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ দাপে, দূর্ দূর্ দূর্ দূর্ কাঁপে,
হর্, হর্, বম্ বম্ রবে, তর্ তর্ জাগে প্রাণ।
সূর্ সূর্ সূর্ সূর্ ধ্বনি, হুর্ হুর্ মার্ মার্ শুনি,
সপ্ সপ্ সপ্ সপ্ পানি, ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ তান্।
"ডাকে" মা, মা, মা, মা, বাবা, "যেন" শিশুর মতন হাবা,
মনোমোহন কয় পাবা, থাক্‌লে এমন টান্। ২৫৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

আট রশীতে বেঁধে রেখে, ডাক্‌ছে বলে আয়রে আয়।
লাফ দিয়া চাই কোলে যেতে, হেচ্‌কা টানে প্রাণতো যায়।
মায়ামন্ত্র ঘোর কুহকে, ঘুরাইতেছ ঘোর বিপাকে,
গ্রহ তারা লাখে লাখে, মিটি মিটি চোখে চায়।
এমনি তোমার হাতের কৌশল, এক রশীতে বাঁধা সকল,
কখন বা কল, কখন বিকল, সবই তোমার পানে ধায়। ২৫৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

দেখি দেখি হৃদিমাঝে অমনি লকুায়ে যায়।
হাসি হাসি শশীমুখী মুখখানা ঢাকে ঘোম্‌টায়।
ছলিতে নিজ কোঙরে, কতই চাতুরী করে,
হারাইয়া ডাকি ফিরে, করজোড়ে আয় আয়।
কখন কখন মনে করি, সে কি আমার আমি তারি,
কেন বা এত চাতুরী, মনোমোহন নিরুপায়। ২৫৯ ॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ – তাল একতালা।

হাত, পা, উদরে, একদিন, লাগ্‌ল ঘোর দ্বন্দ্ব।
যত সব কুড়ে মানুষ শুনে খুব আনন্দ।
পদে কয় কি অপরাধে, ঘুর্‌ব আমি দিনে রেতে,
আহার তুলে দিবে হাতে, তাতে কয় মন্দ।
উদর কেবল বসে বসে, পূর্ণ হবে নানা রসে,
তা বলে দুজনা শেষে, কাজ করে বন্ধ।
খাদ্যাভাবে দিনের দিন, হস্ত পদ হইল ক্ষীণ,
ভাবনা অতি কঠিন, লাগিল বিষম সন্দ।

ভেবে দেখে একে আরে, কেহ কারে নাহি ছাড়ে,
সকলে সকলের তরে, প্রয়োজনে আছে বন্ধ।
মনোমোহন ভাবিয়া কয়, কেহ কার পর নয়,
সকলি সকলের হয়, দেখে না যে অন্ধ। ২৬০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল ঠুংরী

মানুষে যা মন্দ বলে, তাই আমার কর্ত্তব্য করণ।
ভালোর দিকে যেয়ে দেখ্ছি, স্মরণ হয় না জন্ম মরণ।
দেখেছি গৃহস্থের বাটী, ঝাটা দিয়ে সকল ঝাটি,
পচা পচ্লা বিষ্ঠা মাটি, এক জায়গাতে করে রক্ষণ।
কদিন পরে সার ভাবিয়ে, নেয় তারে মাথে তুলিয়ে,
ফসল গাছের গোড়ায় দিয়ে, আনন্দিত চাষার মন।
সার পেয়ে তার জোরের চোটে, ফল ধরে তায় ফুলও ফুটে,
মনোমোহন কয় অম্নি বটে, ও মন ! তোমর সাধন ভজন । ২৬১ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল – কাওয়ালী।

ভব ভাবে তরিতে যদি বাসনা।
একান্ত অন্তরে কর, ইচ্ছা শক্তি সাধনা।
শক্তিতে সমুদয়, সৃষ্টি স্থিতি হয় লয়,
প্রকৃতি পুরুষে মিশে, করে যত রচনা।
নির্গুণ মন পুরুষে, ইচ্ছা শক্তি সহবাসে,
কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্মায়ে দিছে যাতনা।
শক্তিকে পুরুষে লয়, কর আর শক্তি ক্ষয়,
হবে না জেনো নিশ্চয়, পূর্ণ হবে কামনা। ২৬২ ॥

রাগিণী বেহাগ – তাল আড়া।

শক্তিকেন্দ্রে আছে মানুষ, নিরবধি করে খেলা।
ভাব সমষ্টি মানবের মন, দোল খেলাইছে সারা বেলা।
আমিত্বে হেলায়ে গা, ত্রিভঙ্গে রেখেছে পা,
তারে নারে, তা না, না, না, তা ধিন্ ধিন্ ধিন্ বাজে তালা।
সে রহস্যে পড়ে ধরা, জীব সমষ্টি সবে মরা,
মনোমোহন ভেবে সারা, চাবি বদ্ধ যায় না খোলা। ২৬৩ ॥

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ – তাল কাওয়ালী।

দয়াময় নাম মহামন্ত্র, গুরু দিল আমার কানে,
যেন, কত শান্তি সুধারাশি, বিতরিল তপ্ত প্রাণে।
চমকিত মন চমকিত শ্রবণ,
শিহরিল হৃদি, তৃষিত নয়ন,
অবিরল ধারা ঢালিয়া ঢালিয়া, ঢলিয়া পড়িল রাঙ্গা চরণে।
যমুনার জল উজান ছুটিল,
কুহু কুহু করি কোকিল ডাকিল,
শ্যামের বাঁশরী স্বভাবে বাজিল, তোষিল কিশোরী মধুরালিঙ্গনে।
আইল ধাইয়া মধূকরগণে,
চিরফুল্ল ফুলে মধু আহরণে,
ভাব পয়োধর উথলিল রঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে তার আহ্বানে।
মলয়া পরশি সরসী নীরে,
পুলকে পূরিল চিত শিহরে,
(দিলে) মৃত্যু–বিজয়িনী-শক্তি সঞ্চারিয়া, প্রেম সুধাসিন্ধু অমিয়া মন্থনে।
সে আনন্দ প্রাণে মাখিয়া মাখিয়া,
আনন্দ চরণ হৃদয়ে রাখিয়া,
পরম আনন্দ জ্যোতিরে ডাকিয়া, পাইল আনন্দ মনোমোহন। ২৬৪ ॥

রাগিণী কালেংড়া – তাল ঠুংরী।

“যে নিশা লেগেছে আমার, নিশা যেন না ছুটে।”
পলকে পলকে যেমন, তাঁরে মনে উঠে।
গাঁজার নিশা মদের নিশা,
তাতে হই নাই হারা দিশা,
ভাবের নিশায় পাগল হলেম, দিশা নাইকো মোটে।
যে নিশা লেগেছে চোখে,
স্বপন দেখি নিশার ঝোকে,
মায়ের কোলের শিশু যেমন, চম্‌কে চম্‌কে উঠে।
নিশায় করে মিশামিশি,
জাতি কুল মান গেছে ভাসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা গেছে, অই যে নিশার চোটে।
ঝুল্‌নি কাথা করঙ্গ সার,
নিশাতে হল আমার,
ঘৃণা লজ্জা ভয় ইত্যাদি বিকায়েছি হাটে।
শুন্ বলি মন নেশা খোর,
দেখ্‌ত নেশার কত জোর,
হলে নেশায় ভোর ভোর, অন্ধকারে চন্দ্র ফুটে।
মনোমোহন ছেড় না নিশা,
সার কর ভাই কান্দা হাসা,
কম পড়বে না রতিমাষা, মায়ার বেড়ী যাবে কেটে। ২৬৫ ॥

শ্রী শ্রী গোরাঙ্গ লীলা বিষয়ক গান।

রাগিণী প্রেমের হাট বসেছে – তাল খেম্‌টা।

নদীয়ায় চাঁদের হাট বসেছে।
চাঁদের হাটে অমূল্য চাঁদ, বিনা মূলে যাচ্‌তেছে।
গগনে কলঙ্কী চাঁদ, চাঁদ ষোল কলা,
বাড়ে কমে দিনে দিনে, নিত্য চাঁদের লীলা,
অকলঙ্ক চৈতন্য চাঁদ, নিতাই চাঁদ সঙ্গে জুটেছে।
(বাড়ে বই আর কমে না চাঁদ, অমনি চাঁদ উঠেছে)।
আরও কত ভক্তচাঁদ, চাঁদে বহু কলা,
হৃদে জাগে কৃষ্ণচাঁদ, মুখে হরি বলা,
বিরহ মিলন চাঁদে, প্রেমের জ্যোৎস্না ফুটেছে।
চাঁদের হাটে চাঁদের মেলা, চাঁদ বিনে আর নাই,
চাঁদে চাঁদে কর্‌ছে খেলা, চাঁদের ফুল ফুটেছে তাই,
তার গন্ধ পেয়ে ধন্ধ হয়ে, মন অলি ছুটেছে।
(মকরন্দের গন্ধ পেয়ে মন মধুকর ছুটেছে)
ছিল চকোর শূন্য পথে, পি'তে চাঁদের সুধা,
অলি ছিল ফুল বাগানে, গেয়ে গুন্ গুন্ গাঁথা,
চাঁদের বাজার দেখে চকোর, অলির সঙ্গে জুটেছে।
মনোমোহনের মন অলি, জ্ঞান চকোর এক যোগে,
ভক্তি সুধা পান করিতে, মত্ত হয়ে অনুরাগে,
রসিক চাঁদের রসের হাটে, কাঙ্গাল হয়ে বসে আছে। ২৬৬ ॥

রাগিণী মুলতান মিশ্র – তাল খেম্‌টা।

তোরা কে কে যাবি আয়, নদীয়ায় ভাই,
ভব পারে নিয়ে যেতে, ডাকেরে দয়াল নিতাই।
নিতাই হরি বল্ বলে, ডাকে দুই বাহু তুলে,
বক্ষভাসে চক্ষের জলে, প্রেমানন্দে নাচে গায়।
নিতাই পরম দয়াল, পাপী তাপীর লেগেছে কপাল,
মার খেয়ে প্রেম যাচে, নিতাই ডাক্‌ছে বলে আয়রে আয়।
মহা পাপীর পরিত্রাণে, নিতাই হরি গুণ গানে,
যারে তারে ধরে টানে, কোল দিয়ে কয় হরিবল্ ভাই।
নামে প্রেম উথলে মনে, দয়াল নিতাই নামের গুণে,
তরাইল জগজ্জনে, সাক্ষী রল জগাই মাধাই। ২৬৭ ॥

রাগিণী বাউলের সুর – তাল একতালা।

হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে যার, তারা দুভাই এসেছে এসেছে।
মধুর হরির নামে রাধার প্রেমে ঢেউ খেল্‌তে আছে।
যাহে মধুর রস ঝরে, সেই হরির নাম ঘরে ঘরে,
যারে তারে প্রেমধন যাচে।
হ্যারে পতিতকে তরাবে বলে, উদয় হইয়াছে।
জগা-মাধা দুভাই তারা, প্রেমানন্দে বহে ধারা,
পাগল পারা, কান্দতে আছে।
আবার জয় রাধা শ্রীরাধা বলে আনন্দে নাচে।
সদায় হরি হরি বলি, নাচে দুটী বাহু তুলি, চক্ষের জলে
বক্ষ ভাসতেছে।
এমন মধুর নামে প্রাণ গলে না, কি হবে পিছে। ২৬৮ ॥

রাগিণী বাউলের সুর – তাল একতালা।

হরি বলে বাহু তুলে নেচে আয়।
পতিত পাবন গৌর হরি, রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গাপায়।
গৌর নাচে, নিতাই নাচে, শ্রীবাস আঙ্গিনার মাঝে,
জগা মাধা দুভাই নাচে. নেচে নেচে প্রেম বিলায়।
প্রেমে মত্ত হয়ে গৌরা, মুখে বলে রা, রা, রা, রা,
দুনয়নে বহে ধারা, ধারায় অঙ্গ ভেসে যায়।
আনন্দে দুই বাহু তুলে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে, ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
মনোমোহন কয় নামের কাছে, এ জগতে কি ধন আছে,
নামে রুচি যার হইয়াছে, দূরে গেছে শমন দায়। ২৬৯ ॥

রাগিণী মিশ্র – তাল কাওয়ালী।

পূর্ণ প্রকটিত হরিনাম, হল দয়াময় সাধনে।
রাম নরসিংহ মৎস্য কূর্ম্ম কৃষ্ণ বরাহ বামণে।
অতি আলোকিত চিত, বুদ্ধ চৈতন্য সহিত,
শিবশক্তি সমাহিত, বিভূতি শ্বেত বরণে।
উপদেষ্টা গুরুভাব, পাইল দেখ মানব,
পুলকে পূরিত চিত, অভিনব ভাব দর্শনে । ২৭০ ॥

রাগিণী বাউলের সুর – তাল যৎ।

প্রেম বাজারে হরির নাম লুট বিলায়।
নামে প্রেমে লোটালোটী, সাধ থেকে যার নিবি আয়।
প্রেম বাজারের বিকিকিনি, নামের সন্দেশ নামের চিনি,

তার কি থাকে ভবক্ষুধা, এই মিঠায় যে মিঠা পায়।
মণ্ডা মিঠাই মুখের মিঠা, হরির নাম হৃদয়ের মিঠা,
যে পেয়েছে প্রাণের মিঠা, মুখের মিঠা সে কি চায়।
যে মিঠাতে নারদ ঋষি, বীণা বাজায় দিবানিশি,
যে মিঠাতে গৌর নিতাই, ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
মনোমোহন কয় মিঠার লোভে, তিতা খেয়ে আছি ডুবে,
পেলেম্ না সে সুধা মিঠা, যে মিঠাতে প্রাণ জুড়ায়। ২৭১ ॥

রাগিণী মনোহরসাই – তাল একতালা।

হাইল ছেড় না, ভয় ক'রো না, হরি বলে ধর পারি।
দীনবন্ধু হরি, করুণা বিতরি, বে'য়ে নিয়ে যাবে তরী।
তরঙ্গ গর্জনে, কি শঙ্কা কররে,
সত্যের তরণী, নির্ভয়ে চড়রে,
বল অবিরাম, দয়াময় নাম, আনন্দ বদনে দুবাহু প্রসারি।
যদি কাল মেঘ আকাশের কোণে,
দেখা দেয় কভু, গভীর গর্জ্জনে,
বিশ্বাস অঙ্কুশে, দুর্জ্জয় সাহসে, আঘাত করিলে যাবে অপসারি।
পাড়ি দিবে যদি, ভব পারাবার,
সত্যের ক্ষেপণি, মার বার বার,
কররে হুঙ্কার, যাবে অন্ধকার, ছুটিবে আলোক দিগন্ত প্রসারি।
কে রুধিবে গতি, উদাসী যে জন,
অমানুষী তার, চরিত্র গঠন,
সাগরে পাহাড়ে, পথ দেয় তারে, মনোমোহন বলে নির্ভয়ে
ফুঁকারি। ২৭২ ॥

শ্রীমদ্ আচার্য্য আনন্দ স্বামী মহাশয়ের তিরোভাব।

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল ঠুংরী।

গিয়েছ যদি অমর ধামে আনিতে অমৃত বারি।
দেখিও যেন আমরা সবে, থেক না কভু পাসরি ॥
যারা অমৃত আকাঙ্ক্ষিত, পিপাসী আকুল চিত,
না হয় যেন কভু বঞ্চিত, দীন কাঙ্গাল ভিখারী ॥
যারা হৃদি পদ্মাসনে, নিমগ্ন তোমারি ধ্যানে,
জানে না আর অন্য জনে, বিনে সে পদ তোমারি।
মহেন্দ্র, মনোমোহন, গুলমামুদ, পঞ্চানন,
কুমার, কৃষ্ণ, বিশ্বম্ভর, দয়াল, গোপাল, জুলমত্কারী। ২৭৩ ॥

রাগিণী মিশ্রসুর – তাল কাওয়ালী।

আমি দয়াময় নাম ধরেছি।
দয়ার সনে, তোদের মনে, প্রেমভক্তি দান করেছি ॥
তোদেরে যাইনি ভুলে, তোরা আমার কোলে,
খেল্ব বলে নূতন খেলা, আপনি আপন লুকা'য়েছি।
তোদের কান্না শুনে, আমার মানে না প্রাণে,
কান্দিস না রে আকুল হয়ে, আমি তোদের সেই রয়েছি।
আমায় ভুলে না যাবি, প্রাণ ভরে ডাক্‌বি,
দেখ্‌বি তখন হৃদয় মাঝে, কেমন উদয় হয়েছি। ২৭৪ ॥

রাগিণী লগ্নী – তাল ছপ্‌কী।

কোথাও যাইনি আমি তোদেরে ছেড়ে।
আমি হারা হয়ে কভু তোরা আমায় ভুলিস্‌নারে।
দূরে নহি কাছে কাছে, আছি সদা পাছে পাছে,
সমাধি লয়েছি আমি তোমাদেরই হৃদ্‌মাঝারে।
জগতজন তারিতে, এসেছিনু অবনীতে,
তাই দিয়াছি নাম সুধা, অবিরত মুক্ত করে।
নাম যেখানে আমি তথা, নামের সনে আছি গাঁথা,
ডাক্‌বি যখন দেখ্‌বি তখন, অভয় দিব অন্তরে।
আমি আলো তোরা ছায়া, তোদের সনে এক কায়া,
আড়াল থেকে ভাব্‌ছি বসে, নিয়ত মঙ্গল তরে।
আশা পেয়ে অনুক্ষণ, কহিছে মনোমোহন,
বিরহ মিলনে লয়, হয়ে যাবে সত্বরে। ২৭৫ ॥

১৩০৯ সন মহালয়া প্রতিপদ।
পিতৃদেবের তিরোভাব বৎসরান্ত
উপলক্ষে

রাগিণী বসন্ত – তাল যৎ।

সম্বৎসর হল দেব ত্যজিয়া গিয়াছ মোরে।
কোথা আছ জানি নাক, তবু প্রাণ কেঁদে ফিরে।
কত স্নেহ ছিল মনে, মমতা মাখান প্রাণে,
কেমনে ভুলি এক্ষণে, রহিয়াছ তুমি দূরে।
দুঃখ কষ্ট পাব বলে, নিজ প্রাণ দিতে ঢে'লে,
এখনে যে গেছ ফেলে, কে আর জিজ্ঞাসা করে।
পাখী যেমন পাখা দিয়া, শিশুছা রাখে ঢাকিয়া।
তেমনি করি আবরিয়া, রাখিতে সর্ব্বদা ক্রোড়ে।
এবে শত দুঃখ পাই, দেখিতে না পাও তাই,
দেখেও মমতা নাই, বাহ্য লীলা গেছে দূরে।
যেখানে সেখানে থাক, ভুলিতে তো পারি নাকো,
জেগে উঠে স্মৃতি তব, ও মুখ হৃদয় দ্বারে।
শুধু আজি বলে নয়, যত দিন ভবে রয়,
আমার এ দেহ পিতঃ কাঁদিবে এমনি করে। ২৭৬ ॥

মুসলমানী গান।

রাগিণী কালেংড়া – তাল কাহারবা।

আদম খোদা মইত্ কহজি।
নুর্‌ছে আদম্ বানায়া, একদম্ জুদা নেহি।
আল্লা আছে আলেবে,
সাবুদ কর কালেপে,
ধ্যানে দিদার ধুঁন্দে ফকির দইরাপ্ত কর দিল্‌মেজি।
ধর্‌বে যদি মাশুকে,
ডুরী লাগাও আশেকে,
(হ'লে) দিল্ দেওয়ানা ফানা ফিল্লা, রাজি হবে আল্লাজি।
তিন্ তিন্ রোয়ে যিন্ পায়া,
হাসি খেল্‌না মিলে পিয়া,
মনোমোহন কয় দিলদরিয়া সিচ্‌লে পাবি সাই দরদি। ২৭৭ ॥

রাগিণী বারোঁয়া – তাল একতালা।

গায়েবী আওয়াজে কয়, শুন্‌রে মুসলমান।
আখেরে দুনিয়া ফানা, রাখরে ইমান্।
চুরি করা মিছা কওয়া, বেসরা বেপর্‌দা হওয়া,
পরহেজ সবুরে মেওয়া, কোরাণে ফরমাণ্।
জরু লার্‌কা দুনিয়ার, সম্‌ঝে দেখ ফক্কিকার,
মওত আজাবে তার, হইবে ইন্‌সান্।
দিলের গড়্‌রী ছাড়, হাদিসের কথা ধর,
কেয়ামত এয়াদ্ কর, হাসরের ময়দান্।
হর্‌দমে আল্লার নাম, ফুকার দুনিয়ার কাম,

ভুকে অন্ন পিয়াসে পানি, এতিমেরে দিও দান।
ভাবিয়ে মনোমোহন কয়, আল্ করিম দয়াময়,
জাতে ভাতে জোদা নয়, জমিন আস্‌মান।
একই হরফে জোড়া, ভাবে যারা বুঝে তারা,
আপ্তাবদ্দি দিশেহারা, বড় পেরেসান। ২৭৮ ॥

রাগিণী বারোঁয়া – তাল একতালা।

হুকুমে আইছরে বন্দা তলপে তালাস।
হায়াতে মওতে করে একই ঘরে বাস।
পিতার মস্তকে ছিলি, মায়ের উদরে আইলি,
জনম লইলি যে তার, কর্‌লেনি নিকাশ।
জরু লার্‌কা জমিদারী, পেয়ে হইলে বেহুইসারী,
মজা মার্‌লী দিন দুই চারি গলায় লইয়া ফাঁস।
কেরামিন্ কাতেবিন্ কান্ধে, হর্ রোজের হিসাব বান্ধে,
মন তুমি ঠেকেছ ফাঁদে, দেখি না খালাস।
দোমের উপর বাড়ী ঘর, দোম ছাড়িলে সকল পর,
কে লইবে কার খবর, কবরে নিবাস।
কেয়ামতে কবরে ভাই, কেহ কারো বন্ধু নাই,
কি করে আলেকসাই, আপ্‌তাপের তরাস।
সেলাম বন্দেগী করে, মুরশিদের পায়ে ধরে,
গাফুরে রেহ্‌মান তারে করবে নি খালাস।
সময়ে সকলি হয়, অসময়ে কেহ নয়,
রোজগারের সময় করে, ভাইয়েরা তালাস।
আখেরে দুনিয়া ফানা, দেখিয়ে কান্দেরে মনা,
সময় থাকিতে কর জমিন মিরাস। ২৭৯ ॥

রাগিণী বারোঁয়া – তাল একতালা।

খোদে খোদা আল্লা রাধা দোস্ত মহম্মদ।
অজুদে মজুদ সাঁই, দমে কেয়ামত ॥
কোরাণে কয় নামাজ রোজা, বেহেস্তে যাওয়ার রাস্তা সোজা,
হজরতে কয় লামাও বোঝা করে খেজমত।
সরিয়তে করে সন্ধি, তরিকতে বুঝ ফন্দি,
হকিকতে ইমান বান্ধি, কর এবাদত্।
আদ্মি আদমের জাত, হরদমে কর ইয়াদ্,
লাশরিক লামৌজুদ আল্লা, ফতে মারফত্।
মনোমোহন পেরেসান, খুঁজে হিন্দু মুসলমান,
করিম কৃষ্ণ, রহিম রাম, শিব হজরত্।
বিস্মিল্লাতে বিষ্ণু হয়, কির্দ্দগারে দয়াময়,
ফাতেমা করিম কালী, আলেক্ হুম্ তৎসৎ।
ইয়াহু পরম হংস, সত্যের নাই কোন ধ্বংস,
আব্ পানি, জলের বংশ, একে হরেক মত। ২৮০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল মধ্যমান।

কও দেখি মন আমার কাছে, তুমি হিন্দু না কি মুসলমান।
আল্লা না হরি তোর ঠাকুর বটেরে, তুই কে তোর মনিব কেরে,
করের ইন্সান।
তুমি আমি আদি যত কায়া আছে, কে বিরাজে বল এসব কায়ার মাঝে,
প্রাণে প্রাণে টানে টানে জাত বিচার নাই দেখি প্রমাণ।
আওরতে মরদে তামাম দুনিয়া, আলেকসাই গুরু পয়দিস করিয়া,
দিলের মাঝে আছে নিজে লুকাইয়া, করিয়া দেখ সন্ধান।

জাতে ভাতে তাতে নাহি ঠেলাঠেলি, প্রাণে প্রাণে করে
প্রেমের কোলাকোলি,
কেও বা হরি বলি, কেও বা আল্লা বলি, বোলে বোলে র'ল
মূলেতে হয়রান্।
যদি একে আরে না টানিত কভু, ভেদাভেদ করে বেছে নিতাম প্রভু,
ভেবে দেখ দিলে, যোগ দিলে সব মিলে, মনোমোহন কেন
হলি পেরেসান।
জনমে মওতে আওরতে মরদে, এক ডুরিতে বাঁধা আস্মানে জমিতে,
আপ্তাবদ্দিন কয়, হতে পার্লে হয়, জ্ঞানী দেখে সত্য ফুট্লে
আত্মজ্ঞান। ২৮১ ॥

রাগিণী মুলতান – তাল কাওয়ালী।

ফকিরি লইতে মমিন মনে যদি আছে।
আগে এক "ব" মাঝে দুই "ব" তিন "শ" রেখ পাছে।
মুরশিদের কথা লইয়া, সাধরে আনন্দ হইয়া,
থাক্তে পারলে রইয়া সইয়া হাসিলি আছে।
জরু লার্কা দুনিয়ার, কেবা সঙ্গে যাবে কার,
দুই চক্ষু বুজিয়া গেলে, সকলই মিছে।
কালেবে আলেক্ সাই, তালাসিয়া দেখ ভাই,
মক্কা মদিনা যত সকলই কাছে।
দিলের গড়রী ছাড়, হাকিমের হুকুম ধর,
কেয়ামত স্মরণ কর, কি হবে পিছে।
আপ্তাবদ্দি নিরুপায়, মুর্শিদ্ কহিছে তায়,
সাবুদ ইমানে চায়, পায় নৈলে মিছে। ২৮২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

যাবি যদি মন ফকির হাটা।
মুর্শিদাবাদ গিয়ে তবে, পরওয়ানা লও মোহর আটা।
ধরিয়ে পীরের কদম, খেজমতে কর নরম,
যতক্ষণ থাকে দম্, ভুলনা সেই ঐ কথাটা।
ইমান করে বসে থাক, সবুর পরহেজ রাখ,
হুজুরি দিলেতে ডাক, শক্ত করে বুকের পাটা।
সেই হাটের দোকানী যারা, জেতা নয় কেও সবাই মরা,
মর্‌তে পারলে দিবে ধরা, জেতা মরা শক্ত লেঠা।
লইয়ে কলঙ্কের ডালি, সইতে পার্‌লে গালাগালি,
পুড়্‌তে পুড়্‌তে হলে ছালি, ধূলা বালির খেয়ে ইটা।
সার করিয়ে জঙ্গলা ঝোপ, দিল্ দরিয়ায় মারলে ডুব,
মনোমোহন কয় ছাড়্‌লে লোভ, কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় ফকিরির বাটা। ২৮৩ ॥

রাগিণী ভৈরোঁ মালকোষ – তাল লোফা।

নয়ন টানে, টানে গো অই রূপের পানে।
আমার মন মিশেছে যাহার সনে।
যার পরশে হয় সরস হৃদয়,
দর্শনে যার হর্ষের উদয়,
সেই, মনের মতন মানুষ রতন, বেঁধে রাখি কোন্ সন্ধানে।
জাগরণে তারে, না দেখিতে পেয়ে,
ঘুমের আড়ালে, থাকি নয়ন দিয়ে,
যদি, স্বপণের ঘোরে, দেখা দেয় সে মোরে, বাঁধিয়া রাখিব স্বপনে।
এত ভালিবাসি, এত যারে চাই,

সে কি আমার কথা, ভাবেনারে ভাই,
যেন আকুল পিয়াসা, ব্যাকুল আবেগে, তাহারে আনিবে টেনে।
নয়নে নয়নে, রাখিব বান্ধিয়া,
কাঙ্গালের পাখী, যাবি কই ছুটিয়া,
বলে মনোমোহন, মন ভুলান ধন, বাঁচিনা তোমারে বিনে। ২৮৪ ॥

রাগিণী ধান্‌শী – তাল একতালা খয়রা।

হয়ত চরম তরী নয়ত চরণ তরী
তরিতে দুই তরী আছে।
ঘাটে বাঁধা তরী, চড় তাড়াতাড়ি, এক তরী তো
তোরে নিয়ে চলেছে।
দুমে দুমে যায় ভাটীর দিকে ছুটে,
লাগ্‌বে যেয়ে কালে, শমন রাজার হাটে,
তখন হবে শমনজারী, লাগ্‌বে হাতে কড়ি,
তাতে মারামারি কত আছে।
আর এক তরী, তার নিকটে নিকটে,
উজান্ পথে যেয়ে, লাগে মুক্তি ঘাটে,
গেয়ে নামের সারি, হাতে হাতে ধরি, উঠে যেয়ে কত নেচে নেচে
ভাটীর তরী তার, আনাড়ি ছয় মাঝি,
কর্ণধার এক বেটা, কথায় হয় না রাজি,
তাতে আছে ঘূর্ণিপাক্, যাত্রী লাখে লাখ, পাকে পাকে ডুব্‌তেছে।
উজান্ তরী তার, সুজন কর্ণধার,
মাঝি সবাই ভাল, টানে ভক্তিদাড়,
যদি ক্ষুধা লাগে পথে, সুধা দেয় সে খেতে, তরী ডুব্‌লেও না মরণ আছে।

আছে দুই তরী, কোন্ তরিতে মন,
উজান তরী ত্বরা, কর আরোহণ,
বলে মনোমোহন, হরি বল মন, চড় চড় চড় চরণ তরী মাঝে। ২৮৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট – তাল মধ্যমান্।

হৃদিপদ্মে প্রাণভ্রমরা,
পিয় মধু মন সুখে, মুখে বল রা রা রা।
ভক্তি বারির পড়ে ছিটে, রাধা পদ্ম উঠ্‌ল ফুটে,
আয় মধুকর আয়না ছুটে, সৌরভ লুটে নেও ত্বরা ॥
মলয় হাওয়া ধীরে ধীরে,
পাপ্‌ড়ি দোলায় প্রেমভরে,
ডাকে তোমায় নয়ন ঠেরে, মৃদু হাসি রসে ভরা ॥
মধুর লোভে পুষ্পের ধারে,
বেড়া ও নাকি ঘুরে ফিরে,
আমার ভক্তি পুষ্প আদর করে, ডাকে তোমায় দাও ধরা ॥
চাইনা স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ,
তুমি আমার উপসর্গ,
ভোগ করহে তোমার ভোগ্য, আমি হই জীয়ন্তে মরা ॥
চারি, ছয়, দশ, বার,
ষোড়শ, দ্বিদল আর,
আছে পদ্ম মনোহর, মৃণাল তন্তুতে জোড়া ॥
ভ্রমণ করে ফুলে ফুলে,
পিয় মধু কুতূহলে,
তার পরে সহস্র দলে, পিয়রে অমৃত ধারা ॥

জীবনান্ত সন্ধ্যাকালে,
মহাপদ্ম মুদিত হলে,
তুমি বদ্ধ থেক সেই ফুলে, মনোমোহনের মনচোরা । ২৮৬ ॥

রাগিণী বসন্ত – তাল যৎ।

ভাবুক বুঝে ভাবের মরম, অন্য লোকে বুঝে কি ?
কুহুস্বরে বিরহী প্রাণ, আপ্‌নি উঠে চমকি।
লতা পাতায় যে সব রেখা, তাতে দেখে প্রণয় লেখা,
ফুল্ল ফুলে নদীর জলে, ঢেউ খেলে তার প্রাণ পাখী।
নীলাকাশে থরে থরে, মেঘ ছুটে যায় বায়ুভরে।
সৌদামিনী তার ভিতরে, কেন এমন দেয় উকি।
চাঁদের করে রবির করে, সন্ধ্যাকালে রাত্ দুপুরে,
কি কয়ে যায় ঘুরে ফিরে, আবার কোথা দেয় লুকি।
সারাটা দিন উড়ে উড়ে, কেন পাখি ঘুরে ফিরে,
শিশুর চোখে, ঘুমের ঝোকে, হাসি কান্না কেন দেখি।
প্রকৃতির এ নীতি বীণা, সুর তান লয় মূর্চ্ছ না,
ভাবুক বিনে কেউ বুঝে না, কি কয়ে যায় তার আঁখি।
আকাশে পাতিয়া কান, শুনে মনো তাঁরি গান।
হারিয়েছে মন প্রাণ, দেহ মাত্র আছে বাকী। ২৮৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

ফকিরি কি গাছের গোটা।
ঢেঁকি যদি স্বর্গে যাইত বারা বান্‌ত তবে কেটা।
ফকিরি বড়ই শক্ত, ফকির ছিল প্রহলাদ ভক্ত,

বিষ খাওয়াইয়ে আগুন দিয়ে করেছিল লোহা পীটা।
ফকির ছিল হরিদাস, গৌরাঙ্গ লীলাতে প্রকাশ,
বাইশ বাজারে বেত খাইয়ে বাকি ছিল শেষের দোমটা।
রূপ সনাতন ফকির ছিল, বায়ান্ন লাখ ছেড়ে দিল,
ঝুলি কাঁথা সঙ্গে নিয়ে, স্থান পেল সে ফকিরহাটা।
ইব্রাহিম ফকির ছিল, আপন পুত্র জবাই দিল,
আগুনে পরীক্ষা কইল, ইঞ্জিলে তার নামটি আটা।
ফকির ছিল ঈশা, মুসা, ঘট্‌ছে তাঁদের কতই দশা,
মনোমোহন কয় ছাড় আশা, নৈলে বাঁধ বুকের পাটা। ২৮৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

পাগল পাগল সবাই পাগল, তবে কেন পাগল খোটা।
দিল দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ্‌, পাগল বিনে ভাল কেটা।
কেও বা ধনে কেও বা মানে, কেও পাগল অভাবের টানে,
কেও বা পাগল ঘরের কোণে, ভেবে মনে এইটা ঐটা।
কেও বা রূপে কেও বা রসে, কেহ পাগল ভালবেসে,
কেও বা পাগল কান্দে হাসে, ঐ পাগলামির বড় ঘটা।
সবে বলে পাগল পাগল, পাগলামী কি গাছের ফল,
তুচ্ছ করি আসল নকল, সমান সকল তিতা মিঠা।
যার হয়েছে সে আসল পাগল, তা বিনে আর নকল সকল,
কলের বেকল ঘুর্‌ছে কেবল, বেঁধে জটা দিয়ে ফোঁটা।
হতে গিয়ে অই সে পাগল, মনোমোহনের গেছে সকল,
বাকী আছে গাছের বাকল, ছেলের হাতে খেতে ইটা।
তবু যদি ভাগ্যফলে, দয়া করে সেই পাগলে,
ফাঁকি দিতে পারি কালে, নৈলে কেবল মাথা কোটা। ২৮৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ – তাল একতালা।

কে তুমি কৌতুকময়ী মৃদু মধূর হেসে।
তাল তরঙ্গে নেচে বেড়াও, সুরতরঙ্গে ভেসে।
কে তুমি সতত রঙ্গে,
অবসাদ নাই তব অঙ্গে,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে ভ্রুভঙ্গে, তরঙ্গ ছুটে নিশ্বাসে।
প্রভাতে আর সন্ধ্যাকালে,
শঙ্খঘণ্টা করতালে,
কে তুমি থেকে আড়ালে, নেচে বেড়াও হেসে হেসে।
শিশুর অধর প্রান্তে,
কে তুমি বসে একান্তে,
হেসে হেসে উঠ কেন্দে, খেলিয়ে লীলা রহস্যে।
কে তুমি বিহঙ্গস্বরে,
কি জানি কও ধীরে ধীরে,
কে তুমি নব পল্লবে, ফুল্ল ফুলে আছ বসে।
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে,
কে তুমি খেলিছ রঙ্গে,
গম্ভীর জীমূত নাদে, প্রবল ঝড় বাতাসে।
কে তুমি তোমার তরে,
থেকে থেকে আঁখি ঝরে,
পুলকে প্রাণ শিহরে কর দয়া দীন দাসে। ২৯০ ॥

ভাব – সঙ্গীত।

“ভাবে জীব, ভাবে শিব, ভাবেই সকল।
অনন্ত ভাবের কায়া ব্রহ্মাণ্ড কেবল।”

রাগিণী পিলু – তাল যৎ।

মানুষে করে না কর্ম্ম, শুধু ভাবে করে খেলা।
ভাবাভাবে লেগে দ্বন্দ্ব, পাগল বানায় মানুষগুলা।
আমি করি, তুমি কর,
তুমি আমি আপন পর,
ভাবেরে পুতুল, খেলাইছে দোল, মায়ামঞ্চ বিষম দোলা।
ভাব আকর্ষণে শক্তি,
কর্ম্মেতে দিছে আসক্তি,
যোগেতে হয় ভক্তি মুক্তি, বিয়োগে বাড়াইছে জ্বালা।
কালী ভাব, কৃষ্ণ ভাব,
শিব ভাব, ব্রহ্ম ভাব,
ভাব বিনে কি আছে লাভ, ভাবের চাবি ব্রহ্মতালা।
হলে পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি,
ভাবের টিপে সাধন সিদ্ধি,
মনো কয় সাধকের উক্তি, ব্রহ্মাণ্ড ভাবেরি গোলা। ২৯১ ॥

ওঁ

জয় দয়াময়

সত্য উদ্বোধন

সত্য জগতে এক। এই পরম ভূমাশক্তিকে নাম এবং রূপ দিতে গেলেই গণ্ডীর অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া যায়, সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়, বিশ্বপ্রেমের লাঘব ঘটে। নাম এবং রূপের গণ্ডী ভেদ করিতে পারিলেই মানুষ মহামানবত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারে।

একদিন জগতে এমন সময় আসিবে, সকল জীব ভেদাভেদ ভুলিয়া যাইবে, এক সত্যের আশ্রয়ে জগৎ আশ্রয় নিবে, সাধনের চরম অবস্থা লাভ করিবে। 'দয়াময়' আশ্রয় দান করিবেন, জগৎ মুক্ত হইবে।

'তুমিহে সর্ব্বকুশল করহে আশ্রয় দান।'
'ধন্য ধন্য দয়াময় নাম শ্রীআনন্দ অবতারে
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে জীবন মুক্তি এল দ্বারে।'

আমার দীক্ষা

আমার ১ বৎসর বয়স। শ্রীশ্রীপিতৃদেব মনোমোহন স্বামীজী ৩২ বৎসর বয়সে ১৩১৬ বাং ২০ শে আশ্বিন পরলোক গমন করিলেন। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী সাধনার সঙ্গীকে হারা হইয়া আর গৃহে ফিরিলেন না। গৈরীক-বসনা, সাধ্বী নারী ১ বৎসরের শিশু বুকে নিয়া প্রায় ৬০ বৎসর কাল এই পবিত্র সমাধি পার্শ্বে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া গিয়াছেন। ১৩৭০ বাং সনে ২৩শে আষাঢ় পরলোক গমন করেন।

১৩২৭ বাং সনে মাঘ মাসের কথা। গভীর রাত্রিতে মা আমাকে বুকে নিয়া পিতৃদেবের সমাধি পার্শ্বে শয়ন করিয়াছেন। ঁকালী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি

চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মা তৎক্ষণাৎ আমাকে কোলে নিয়া সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিলেন এবং ঘটনা অবগত হইলেন। শ্মশান ঁকালী পূজার মানসী করিলেন। নাম জপাদি কার্য্য করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপর দিবস কৃষ্ণকুমার সরকার, রজনী সরকার প্রভৃতি ৪/৫ জন ভক্তসহ আমাকে সঙ্গে নিয়া উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে অশ্রুবিগলিত নেত্রে মা আমাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া 'দয়াময়' নাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং বলিলেন 'তোমার পিতৃদেব পরলোক গমনের কিছুদিন পুর্ব্বে তোমাকে কোলে নিয়া আমরা উপাসনা করিয়াছি। উপাসনান্তে স্বামীজী আমাকে নির্দেশ দিলেন এই নির্দিষ্ট– নামে সময় মত তোমাকে দীক্ষিত করিবার জন্য। আজ এই নাম তুমি গ্রহণ কর। সেই দিন স্বামীজীর জীবন আশঙ্কার বিষয়ও আমাকে বলিয়া ছিলেন।" আমি নাম গ্রহণ করিলাম। তারপর সকলের প্রতি বলিতে লাগিলেন, "অদ্য উপাসনায় দয়াময় আদেশ দিয়াছেন, আগামী অমাবস্যায় সুধীরকেসহ শ্মশানে বসিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে।" এই যজ্ঞের স্থান নির্দেশ করিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষের শ্মশান ভূমি, বাড়ী হইতে বেশ দূরবর্ত্তী স্থানে। আমাকে নিয়া অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে ভক্তগণ সহ মা নিজেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, ফাল্গুন মাসে আমাদের সাতমোড়া গ্রামের ঁকালী সাধক ধরণীধর পাল মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন এবং আমাকে সংবাদ পাঠান। আমি সাক্ষাৎ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক আমাদের আশ্রমে পদার্পণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বান নিবেদন করিলাম। তিনি তৎপর দিবস আশ্রমে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোর পিতার হস্ত লিখিত পুস্তকগুলি নিয়া আস্।" প্রায় সমস্ত দিন বসিয়া পুস্তকগুলি পাঠ করিলেন। অন্য আর কেহ গৃহে নাই এমন সময় হঠাৎ স্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া যেই মাত্র আমার হাত ধরিলেন, তৎক্ষণাৎ আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, শিহরণ অনুভূত হইল,

তৎপর গৃহের ১ কোণে টানিয়া লইয়া চলিলেন, একটু স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া পরম কারণ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ কৃপাবিষ্ট হইয়া আমার কর্ণে সুধারাশি মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। এ দীন অজ্ঞকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করিয়া ভজনের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "দেখ তোর পিতার মধ্যে আমি আছি। আমার মধ্যে তিনি আছেন। জগৎ এক অখণ্ড সূত্রে বাঁধা। তোমার পিতার প্রবর্তিত রাস্তায় সাধনে অগ্রসর হও। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলাম"।

"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার
আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।"
॥ শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ ॥

"পিতা মাতা সত্য গুরু, জ্ঞান দাতা কল্পতরু
ভাবগুরু ব্রহ্মময় পরম কারণ।" "মলয়া"

দয়াময় নামের দীন সেবক–
শ্রী সুধীরচন্দ্র দত্ত।

' ' ' '